রাজর্ষি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রণীত।

কলিকাতা
আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
অপার চিৎপুর রোড ৫৫ নং
সন ১২৯৩। মাঘ

মূল্য ১৲ টাকা।

রাজর্ষি।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভুবনেশ্বরী মন্দিরের পাথরের ঘাট গোমতী নদীতে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ত্রিপুরার মহারাজা গোবিন্দ-মাণিক্য একদিন গ্রীষ্মকালের প্রভাতে স্নান করিতে আসিয়াছেন, সঙ্গে তাঁহার ভাই নক্ষত্র রায়ও আসিয়াছেন। এমন সময়ে একটি ছোট মেয়ে তাহার ছোট ভাইকে সঙ্গে করিয়া সেই ঘাটে আসিল। রাজার কাপড় টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?"

রাজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "মা, আমি তোমার সন্তান!"

মেয়েটি বলিল "আমাকে পূজার ফুল পাড়িয়া দাও না!"

রাজা বলিলেন "আচ্ছা চল।"

অনুচরগণ অস্থির হইয়া উঠিল। তাহারা কহিল "মহারাজ, আপনি কেন যাইবেন, আমরা পাড়িয়া দিতেছি।"

রাজা বলিলেন "না, আমাকে যখন বলিয়াছে, আমিই পাড়িয়া দিব।"

রাজা সেই মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সেদিনকার বিমল উষার সঙ্গে তাহার মুখের সাদৃশ্য ছিল। রাজার হাত ধরিয়া যখন সে মন্দির-সংলগ্ন ফুলবাগানে বেড়াইতেছিল, তখন চারিদিকের শুভ্র বেলফুলগুলির মত তাহার ফুট্‌ফুটে মুখখানি হইতে যেন একটি বিমল সৌরভের ভাব উত্থিত হইয়া প্রভাতের কাননে ব্যাপ্ত হইতেছিল। ছোট ভাইটি দিদির কাপড় ধরিয়া দিদির সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছিল। সে কেবল একমাত্র দিদিকেই জানে, রাজার সঙ্গে তাহার বড় একটা ভাব হইল না।

রাজা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি মা?"

মেয়ে বলিল "আমার নাম হাসি।"

রাজা ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?" ছেলেটি বড় বড় চোখ মেলিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিছু উত্তর করিল না।

হাসি তাহার গায়ে হাত দিয়া কহিল "বল্‌ না ভাই, আমার নাম তাতা।"

ছেলেটি তাহার অতি ছোট দুইখানি ঠোঁট একটুখানি খুলিয়া গম্ভীরভাবে দিদির কথার প্রতিধ্বনির মত বলিল "আমার নাম তাতা।" বলিয়া দিদির কাপড় আরও শক্ত করিয়া ধরিল।

হাসি রাজাকে বুঝাইয়া বলিল "ও কি না ছেলেমানুষ তাই ওকে সকলে তাতা বলে।" ছোট ভাইটির দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল "আচ্ছা বল্ দেখি মন্দির।"

ছেলেটি দিদির মুখের দিকে চাহিয়া কহিল "লদন্দ।"

হাসি হাসিয়া উঠিয়া কহিল "তাতা মন্দির বলিতে পারে না, বলে লদন্দ।—আচ্ছা, বল্ দেখি কড়াই।"

ছেলেটি গম্ভীর হইয়া বলিল "বলাই।"

হাসি আবার হাসিয়া উঠিয়া কহিল "তাতা আমাদের কড়াই বলিতে পারে না, বলে বলাই।" বলিয়া তাতাকে ধরিয়া চুমো খাইয়া খাইয়া অস্থির করিয়া দিল।

তাতা সহসা দিদির এত হাসি ও এত আদরের কোনই কারণ খুঁজিয়া পাইল না, সে কেবল মস্ত চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল। বাস্তবিকই মন্দির এবং কড়াই শব্দ উচ্চারণ সম্বন্ধে তাতার সম্পূর্ণ ত্রুটি ছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না; তাতার বয়সে হাসি মন্দিরকে কখনই লদন্দ বলিত না, সে মন্দিরকে বলিত পালু, আর সে কড়াইকে বলাই বলিত কি না জানিনা কিন্তু কড়িকে বলিত ঘড়ি, সুতরাং তাতার এরূপ বিচিত্র উচ্চারণ শুনিয়া তাহার যে অত্যন্ত হাসি পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! তাতা সম্বন্ধে নানা ঘটনা সে রাজাকে বলিতে লাগিল। একবার একজন বুড়োমানুষ কম্বল জড়াইয়া আসিয়াছিল, তাতা তাহাকে ভাল্লুক বলিয়াছিল, এমনি তাতার মন্দ-

বুদ্ধি! আর একবার তাতা গাছের আতা ফলগুলিকে পাখী মনে করিয়া মোটামোটা ছোট ছুটি হাতে তালি দিয়া তাহাদিগকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাতা যে হাসির চেয়ে অনেক ছেলেমানুষ, ইহা তাতার দিদি বিস্তর উদাহরণ দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে প্রমাণ করিয়া দিল। তাতা নিজের বুদ্ধির পরিচয়ের কথা সম্পূর্ণ অবিচলিত চিত্তে শুনিতেছিল, যতটুকু বুঝিতে পারিল তাহাতে ক্ষোভের কারণ কিছুই দেখিতে পাইল না। এইরূপে সেদিনকার সকালে ফুলতোলা শেষ হইল। ছোট মেয়েটির আঁচল ভরিয়া যখন ফুল দিলেন তখন রাজার মনে হইল যেন তাঁহার পূজা শেষ হইল; এই ছুইটি সরল প্রাণের স্নেহের দৃশ্য দেখিয়া এই পবিত্র হৃদয়ের আশ মিটাইয়া ফুল তুলিয়া দিয়া তাঁহার যেন দেবপূজার কাজ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তাহার পরদিন হইতে ঘুম ভাঙ্গিলে সূর্য্য উঠিলেও রাজার প্রভাত হইত না, ছোট ছুটি ভাইবোনের মুখ দেখিলে তবে তাঁহার প্রভাত হইত। প্রতিদিন তাহাদিগকে ফুল তুলিয়া দিয়া তবে তিনি স্নান করিতেন; ছুই ভাইবোনে ঘাটে বসিয়া তাঁহার স্নান দেখিত। যে দিন সকালে এই ছুটি ছেলে মেয়ে না আসিত, সে দিন তাঁহার সন্ধ্যাআহ্নিক যেন সম্পূর্ণ হইত না। রাজাকে তাহারা পিতা বলিত। রাজা তাহাদিগকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন

হাসি ও তাতার বাপ মা কেহ নাই। কেবল একটি কাকা আছে। কাকার নাম কেদারেশ্বর। এই দুটি ছেলে মেয়েই তাহার জীবনের এক মাত্র সুখ ও সম্বল।

এক বৎসর কাটিয়া গেল। তাতা এখন মন্দির বলিতে পারে কিন্তু এখনো কড়াই বলিতে বলাই বলে। অধিক কথা সে কয় না। গোমতী নদীর ধারে নাগকেশর গাছের তলায় পা ছড়াইয়া তাহার দিদি তাহাকে যে কোন গল্পই করিত সে তাহাই ড্যাবাড্যাবা চোখে অবাক্ হইয়া শুনিত। সে গল্পের কোন মাথামুণ্ড ছিল না। কিন্তু সে যে কি বুঝিত সেই জানে; গল্প শুনিয়া সেই গাছের তলায় সেই সূর্য্যের আলোতে, সেই মুক্ত সমীরণে একটি ছোট ছেলের ছোট হৃদয়টুকুতে যে কত কথা কত ছবি উঠিত তাহা আমরা কি জানি! তাতা আর কোন ছেলের সঙ্গে খেলা করিত না, কেবল তাতার দিদির সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত বেড়াইত।

আষাঢ়মাস। সকাল হইতে ঘন মেঘ করিয়া রহিয়াছে। এখনও বৃষ্টি পড়ে নাই কিন্তু বাদ্‌লা হইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। দূরদেশের বৃষ্টির কণা বহিয়া শীতল বাতাস বহিতেছে। গোমতী নদীর জলে এবং গোমতী নদীর উভয় পারের অরণ্যে অন্ধকার আকাশের ছায়া পড়িয়াছে। কাল রাত্রে অমাবস্যা ছিল, কাল ভুবনেশ্বরীর পূজা হইয়া গিয়াছে।

যথা সময়ে হাসি ও তাতার হাত ধরিয়া রাজা স্নান করিতে আসিয়াছেন। একটি রক্তস্রোতের রেখা শ্বেত প্রস্তরের ঘাটের সোপান বাহিয়া জলে গিয়া শেষ হইয়াছে। কাল রাত্রে যে একশ-এক মহিষ বলি হইয়াছে তাহারই রক্ত। হাসি সেই রক্তের রেখা দেখিয়া সহসা এক প্রকার সঙ্কোচে সরিয়া গিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কিসের দাগ বাবা!" রাজা বলিলেন "রক্তের দাগ মা!" সে কহিল, "এত রক্ত কেন?" এমন এক প্রকার কাতর স্বরে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল "এত রক্ত কেন" যে, রাজারও হৃদয়ের মধ্যে ক্রমাগত এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, "বাস্তবিক, এত রক্ত কেন!" তিনি সহসা শিহরিয়া উঠিলেন। বহুদিন ধরিয়া প্রতি বৎসর রক্তের স্রোত দেখিয়া আসিতেছেন, একটি ছোট মেয়ের প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল "এত রক্ত কেন?" তিনি উত্তর দিতে ভুলিয়া গেলেন। অন্যমনে স্নান করিতে করিতে ঐ প্রশ্নই ভাবিতে লাগিলেন, মনে মনে বলিলেন "গোমতী, তুই প্রতি বৎসর কত শত অসহায় নির্দ্দোষী জীবের রক্ত বহন করিয়া আসিতেছিস্, তোর জল এমন বিমল কেন?" হাসি জলে অাঁচল ভিজাইয়া সিঁড়িতে বসিয়া ধীরে ধীরে রক্তের রেখা মুছিতে লাগিল, তাহার দেখাদেখি ছোট হাত দুটি দিয়া তাতাও তাহাই করিতে লাগিল। হাসির অাঁচল খানি রক্তে লাল হইয়া গেল। রাজার যখন স্নান হইয়া

গেল তখন দুই ভাইবোনে মিলিয়া রক্তের দাগ মুছিয়া ফেলিয়াছে।

সেই দিন বাড়ি ফিরিয়া গিয়া হাসির জ্বর হইল। তাতা কাছে বসিয়া দুটি ছোট আঙ্গুলে দিদির মুদ্রিত চোখের পাতা খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া মাঝে মাঝে ডাকিতেছে "দিদি!" দিদি অম্‌নি সচকিতে একটুখানি জাগিয়া উঠিতেছে। "কি তাতা!" বলিয়া তাতাকে কাছে টানিয়া লইতেছে; আবার তাহার চোখ ঢুলিয়া পড়িতেছে। তাতা অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, কোন কথাই বলে না। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে দিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া দিদির মুখের কাছে মুখ দিয়া আস্তে আস্তে বলিল "দিদি তুই উঠ্‌বিনে!" হাসি চমকিয়া জাগিয়া তাতাকে বুকে চাপিয়া কহিল—"কেন উঠ্‌বনা ধন?" কিন্তু দিদির উঠিবার আর সাধ্য নাই। তাতার ক্ষুদ্র হৃদয় যেন অত্যন্ত অন্ধকার হইয়া গেল। তাহার সমস্ত দিনের খেলাধূলা আনন্দের আশা একেবারে ম্লান হইয়া গেল। আকাশ অত্যন্ত অন্ধকার, ঘরের চালের উপর ক্রমাগতই বৃষ্টির শব্দ শুনা যাইতেছে, প্রাঙ্গণের তেঁতুল গাছ জলে ভিজিতেছে, পথে পথিক নাই। কেদারেশ্বর একজন বৈদ্যকে সঙ্গে করিয়া আনিল। বৈদ্য নাড়ি টিপিয়া অবস্থা দেখিয়া ভাল বোধ করিল না।

তাহার পর দিন স্নান করিতে আসিয়া রাজা দেখিলেন

মন্দিরে দুইটি ভাইবোন তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া নাই। মনে করিলেন এই ঘোরতর বর্ষায় তাহারা আসিতে পারে নাই। স্নান তর্পণ শেষ করিয়া শিবিকায় চড়িয়া রাজা বাহকদিগকে কেদারেশ্বরের কুটীরে যাইতে আজ্ঞা দিলেন। অনুচরেরা সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, কিন্তু রাজাজ্ঞার উপরে আর কথা কহিতে পারিল না। রাজার শিবিকা প্রাঙ্গণে গিয়া পৌঁছিলে কুটীরে অত্যন্ত গোলযোগ পড়িয়া গেল। সে গোলমালে রোগীর রোগের কথা সকলেই ভুলিয়া গেল। কেবল তাতা নড়িল না, সে অচেতন দিদির কোলের কাছে বসিয়া, দিদির কাপড়ের এক প্রান্ত মুখের ভিতর পুরিয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। রাজাকে ঘরে আসিতে দেখিয়া তাতা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে!" উদ্বিগ্ন-হৃদয় রাজা কিছুই উত্তর দিলেন না। তাতা ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "দিদির নেগেছে?" খুড়ো কেদারেশ্বর কিছু বিরক্ত হইয়া উত্তর দিলেন "হাঁ, লেগেছে।" অমনি তাতা দিদির কাছে গিয়া দিদির মুখ তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া গলা জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল "দিদি, তোমার কোথায় নেগেছে?" মনের অভিপ্রায় এই যে সেই জায়গাটাতে ফুঁ দিয়া হাত বুলাইয়া দিদির সমস্ত বেদনা দূর করিয়া দিবে। কিন্তু যখন দিদি কোন উত্তর দিল না, তখন তাহার আর সহ্য হইল না— ছোট দুইটি ঠোঁট উত্তরোত্তর ফুলিতে লাগিল, অভিমানে

কাঁদিয়া উঠিল। কাল হইতে বসিয়া আছে, একটি কথা নাই কেন? তাতা কি করিয়াছে, যে তাহার উপর এত অনাদর! রাজার সম্মুখে তাতার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া কেদারেশ্বর অত্যন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে বিরক্ত হইয়া তাতার হাত ধরিয়া অন্য ঘরে টানিয়া লইয়া গেল। তবুও দিদি কিছু বলিল না!

রাজবৈদ্য আসিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়া গেল। রাজা স্বয়ং বালিকার শিয়রের কাছে বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার সময় বালিকা প্রলাপ বকিতে লাগিল। বলিতে লাগিল "ও মাগো, এত রক্ত কেন?" রাজা কহিলেন "মা এ রক্তস্রোত আমি নিবারণ করিব।" বালিকা বলিল—"আয় ভাই তাতা, আমরা দুজনে এ রক্ত মুছে ফেলি।" সন্ধ্যার কিছু পরেই হাসি একবার চোখ খুলিয়াছিল। একবার চারিদিক চাহিয়া কাহাকে যেন খুঁজিল। তখন তাতা অন্য ঘরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কাহাকে যেন না দেখিতে পাইয়া হাসি চোখ বুজিল। চক্ষু আর খুলিল না। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রাজার কোলে হাসির মৃত্যু হইল।

হাসিকে যখন চিরদিনের জন্য কুটীর হইতে লইয়া গেল তখন তাতা অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইতেছিল। সে যদি জানিতে পাইত তবে সেও বুঝি দিদির সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছায়াটির মত চলিয়া যাইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজার সভা বসিয়াছে। ভুবনেশ্বরী দেবীমন্দিরের পুরোহিত কার্য্যবশতঃ রাজ-দর্শনে আসিয়াছেন।

পুরোহিতের নাম রঘুপতি। এদেশে পুরোহিতকে চোন্তাই বলিয়া থাকে। ভুবনেশ্বরী দেবী পূজার চোদ্দ দিন পরে গভীর রাত্রে চতুর্দ্দশ দেবতার এক পূজা হয়। এই পূজার সময় একদিন দুই রাত্রি কেহ ঘরের বাহির হইতে পারে না, রাজাও না। রাজা যদি বাহির হন তবে চোন্তাইয়ের নিকটে তাঁহাকে অর্থদণ্ড দিতে হয়। প্রবাদ আছে এই পূজার রাত্রে মন্দিরে নরবলি হয়। এই পূজা উপলক্ষে সর্ব্ব প্রথমে যে সকল পশুবলি হয় তাহা রাজবাড়ির দান বলিয়া গৃহীত হয়। এই বলির পশু গ্রহণ করিবার জন্য চোন্তাই রাজসমীপে আসিয়াছেন। পূজার আর বারো দিন বাকী আছে।

রাজা বলিলেন—"এ বৎসর হইতে মন্দিরে জীব বলি আর হইবে না।"

সভাসুদ্ধ লোক অবাক্ হইয়া গেল। রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায়ের মাথার চুল পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া উঠিল।

চোন্তাই রঘুপতি বলিলেন "আমি এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি!"

রাজা বলিলেন "না ঠাকুর, এতদিন আমরা স্বপ্ন

দেখিতেছিলাম, আজ আমাদের চেতনা হইয়াছে। একটি বালিকার মূর্ত্তি ধরিয়া মা আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গেছেন, করুণাময়ী জননী হইয়া মা তাঁহার জীবের রক্ত আর দেখিতে পারেন না!"

রঘুপতি কহিলেন "মা তবে এতদিন ধরিয়া জীবের রক্তপান করিয়া আসিতেছেন কি করিয়া?"

রাজা কহিলেন "না, পান্ করেন নি। তোমরা যখন রক্তপাত করিতে তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া থাকিতেন।"

রঘুপতি বলিলেন "মহারাজ, রাজকার্য্য আপনি ভাল বুঝেন সন্দেহ নাই। কিন্তু পূজা সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না। দেবীর যদি কিছুতে অসন্তোষ হইত, আমিই আগে জানিতে পারিতাম।"

নক্ষত্ররায় অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন "হাঁ এ ঠিক কথা! দেবীর যদি কিছুতে অসন্তোষ হইত ঠাকুর মহাশয়ই আগে জানিতে পাইতেন।"

রাজা বলিলেন "হৃদয় যার কঠিন হইয়া গিয়াছে দেবীর কথা সে শুনিতে পায় না।"

নক্ষত্ররায় পুরোহিতের মুখের দিকে চাহিলেন—ভাবটা এই যে, "এ কথার একটা উত্তর দেওয়া আবশ্যক!"

রঘুপতি আগুন হইয়া উঠিয়া বলিলেন "মহারাজ আপনি পাষণ্ড নাস্তিকের মত কথা কহিতেছেন।"

নক্ষত্র রায় মৃদু প্রতিধ্বনির মত বলিলেন "হাঁ নাস্তিকের মত কথা কহিতেছেন!"

গোবিন্দ মাণিক্য উদ্দীপ্তমূর্ত্তি পুরোহিতের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ঠাকুর, রাজসভায় বসিয়া আপনি মিথ্যা সময় নষ্ট করিতেছেন। মন্দিরের কাজ বহিয়া যাই-তছে। আপনি মন্দিরে যান। যাইবার সময় পথে প্রচার করিয়া দিবেন যে, আমার রাজ্যে যে ব্যক্তি দেব-তার নিকট জীব বলি দিবে তাহার নির্ব্বাসন দণ্ড হইবে।

তখন রঘুপতি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পৈতা স্পর্শ করিয়া বলিলেন "তবে তুমি উচ্ছন্ন যাও—" চারিদিক হইতে হাঁ হাঁ করিয়া সভাসদগণ পুরোহিতের উপর গিয়া পড়িলেন। রাজা ইঙ্গিতে সকলকে নিষেধ করিলেন, সকলে সরিয়া দাঁড়াইলেন। রঘুপতি বলিতে লাগিলেন "তুমি রাজা তুমি ইচ্ছা করিলে প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ করিতে পার তাই বলিয়া তুমি মায়ের বলি হরণ করিবে বটে! কি তোমার সাধ্য! আমি রঘুপতি মায়ের সেবক থাকিতে কেমন তুমি পূজার ব্যাঘাত কর দেখিব!"

মন্ত্রী রাজার স্বভাব বিলক্ষণ অবগত আছেন। তিনি জানেন সঙ্কল্প হইতে রাজাকে শীঘ্র বিচলিত করা যায় না। তিনি ধীরে ধীরে সভয়ে কহিলেন "মহারাজ, আপনার স্বর্গীয় পিতৃপুরুষগণ বরাবর দেবীর নিকটে নিয়মিত বলি

দিয়া আসিতেছেন। কখনও একদিনের জন্য ইহার অন্যথা হয় নাই।" মন্ত্রী থামিলেন।

রাজা চুপ করিয়া রহিলেন। মন্ত্রী বলিলেন "আজ এত দিন পরে আপনার পিতৃ-পুরুষদের প্রতিষ্ঠিত সেই প্রাচীন পূজার ব্যাঘাত সাধন করিলে স্বর্গে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইবেন।"

মহারাজ ভাবিতে লাগিলেন। নক্ষত্র রায় বিজ্ঞতা-সহকারে বলিলেন "হাঁ, স্বর্গে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইবেন!"

মন্ত্রী আবার বলিলেন "মহারাজ, এক কাজ করুন, যেখানে সহস্র বলি হইয়া থাকে সেখানে একশত বলির আদেশ করুন!"

সভাসদেরা বজ্রাহতের মত অবাক হইয়া রহিল, গোবিন্দ-মাণিক্যও বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ পুরোহিত অধীর হইয়া সভা হইতে উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

এমন সময়ে কেমন করিয়া প্রহরীদের হাত এড়াইয়া খালি গায়ে খালি পায়ে একটি ছোট ছেলে সভায় প্রবেশ করিল। রাজসভার মাঝখানে দাঁড়াইয়া রাজার মুখের দিকে বড় বড় চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "দিদি কোথায়!"

বৃহৎ রাজসভার সমস্ত যেন সহসা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। দীর্ঘগৃহে কেবল একটি ছেলের কণ্ঠধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল "দিদি কোথায়!"

রাজা তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে নামিয়া ছেলেকে

কোলে করিয়া দৃঢ়স্বরে মন্ত্রীকে বলিলেন "আজ হইতে আমার রাজ্যে বলিদান হইতে পারিবে না। ইহার উপর আর কথা কহিও না!"

মন্ত্রী কহিলেন "যে আজ্ঞে!"

তাতা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল "দিদি কোথায়!"

রাজা বলিলেন "মায়ের কাছে!"

তাতা অনেকক্ষণ মুখে আঙ্গুল দিয়া চুপ করিয়া রহিল, একটা যেন ঠিকানা পাইল এম্‌নি তাহার মনে হইল। আজ হইতে রাজা তাতাকে নিজের কাছে রাখিলেন। খুড়ো কেদারেশ্বর রাজবাড়িতে স্থান পাইল।

সভাসদেরা আপনা-আপনি বলাবলি করিতে লাগিল "এ যে মগের মুল্লুক হইয়া দাঁড়াইল। আমরাত জানি বৌদ্ধ মগেরাই রক্তপাত করে না, অবশেষে আমাদের হিন্দুদের দেশেও কি সেই নিয়ম চলিবে না কি!"

নক্ষত্র রায়ও তাহাদের মতে সম্পূর্ণ মত দিয়া কহিলেন "হাঁ, শেষে হিন্দুদের দেশেও কি সেই নিয়ম চলিবে না কি!"

সকলেই ভাবিল অবনতির লক্ষণ ইহা হইতে আর কি হইতে পারে! মগে হিন্দুতে তফাৎ রহিল কি?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভুবনেশ্বরী দেবীমন্দিরের ভৃত্য জয়সিংহ জাতিতে রাজপুত, ক্ষত্রিয়। তাঁহার বাপ সুচেৎ সিং ত্রিপুরার রাজ-

বাটির একজন পুরাতন ভৃত্য ছিলেন। সুচেৎ সিংহের মৃত্যুকালে জয় সিংহ নিতান্ত বালক ছিলেন। এই অনাথ বালককে রাজা মন্দিরের কাজে নিযুক্ত করেন। জয়সিংহ মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতির দ্বারাই পালিত ও শিক্ষিত হইয়াছেন। ছেলেবেলা হইতে মন্দিরে পালিত হইয়া জয়সিংহ মন্দিরকে গৃহের মত ভাল বাসিতেন, মন্দিরের প্রত্যেক সোপান, প্রত্যেক প্রস্তর-খণ্ডের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহার মা ছিল না, ভুবনেশ্বরী প্রতিমাকেই তিনি মায়ের মত দেখিতেন, প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া তিনি কথা কহিতেন, তাঁহার একলা বোধ হইত না। তাঁহার আরও সঙ্গী ছিল। মন্দিরের বাগানের অনেকগুলি গাছকে তিনি নিজের হাতে মানুষ করিয়াছেন। তাঁহার চারিদিকে প্রতিদিন তাঁহার গাছগুলি বাড়িতেছে, লতাগুলি জড়াইতেছে, শাখা পুষ্পিত হইতেছে, ছায়া বিস্তৃত হইতেছে, শ্যামল পল্লবস্তবকে যৌবনগর্ব্বে নিকুঞ্জ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু জয়সিংহের এ সকল প্রাণের কথা, ভালবাসার কথা বড় একটা কেহ জানিত না; তাঁহার বিপুল বল ও সাহসের জন্যই তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

মন্দিরের কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া জয়সিংহ তাঁহার কুটীরের দ্বারে বসিয়া আছেন। সম্মুখে মন্দিরের কানন। বিকাল হইয়া আসিয়াছে। অত্যন্ত ঘন মেঘ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। নব বর্ষার জলে জয়সিংহের গাছগুলি স্নান

করিতেছে, বৃষ্টি বিন্দুর নৃত্যে পাতায় পাতায় উৎসব পড়িয়া গিয়াছে, বর্ষাজলের ছোট ছোট শত শত প্রবাহ ঘোলা হইয়া কল্‌কল্ করিয়া গোমতী নদীতে গিয়া পড়িতেছে— জয়সিংহ পরমানন্দে তাঁহার কাননের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। চারিদিকে মেঘের স্নিগ্ধ অন্ধকার, বনের ছায়া, ঘন পল্লবের শ্যামশ্রী, ভেকের কোলাহল, বৃষ্টির অবিশ্রাম ঝর্‌ঝর্ শব্দ—কাননের মধ্যে এইরূপ নব-বর্ষার ঘোরঘটা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ জুড়াইয়া যাইতেছে।

ভিজিতে ভিজিতে রঘুপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জয়সিং তাড়াতাড়ি উঠিয়া পা ধুইবার জল ও শুক্‌ন কাপড় আনিয়া দিলেন। রঘুপতি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমাকে কাপড় আনিতে কে কহিল?" বলিয়া কাপড়গুলা লইয়া ঘরের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। জয়সিং পা ধুইবার জল লইয়া অগ্রসর হইলেন। রঘুপতি বিরক্তির স্বরে কহিলেন— "থাক্ থাক্, তোমার ও জল রাখিয়া দাও!" বলিয়া পা দিয়া জলের ঘটি ঠেলিয়া ফেলিলেন। জয়সিং সহসা এরূপ ব্যবহারের কারণ বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইলেন— কাপড় ভূমি হইতে তুলিয়া যথাস্থানে রাখিতে উদ্যত হই-লেন—রঘুপতি পুনশ্চ বিরক্তভাবে কহিলেন—"থাক্ থাক্, ও কাপড়ে তোমার হাত দিতে হইবে না।" বলিয়া, নিজে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া আসিলেন। জল লইয়া পা ধুইলেন। জয়সিংহ ধীরে ধীরে কহিলেন "প্রভু আমি কি কোন অপ-

রাধ করিয়াছি?” রঘুপতি কিঞ্চিৎ উগ্রস্বরে কহিলেন “কে বলিতেছে যে তুমি অপরাধ করিয়াছ!” জয়সিংহ ব্যথিত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। রঘুপতি অস্থির ভাবে কুটীরের দাওয়ায় বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে রাত্রি অনেক হইল; ক্রমাগত বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। অবশেষে রঘুপতি জয়সিংহের পিঠে হাত দিয়া কোমলস্বরে কহিলেন, “বৎস শয়ন করিতে যাও, রাত্রি অনেক হইল।” জয়সিং রঘুপতির স্নেহের স্বরে বিচলিত হইয়া কহিলেন “প্রভু আগে শয়ন করিতে যান তার পরে আমি যাইব।” রঘুপতি কহিলেন “আমার বিলম্ব আছে। দেখ পুত্র, তোমার প্রতি আমি আজ কঠোর ব্যবহার করিয়াছি, কিছু মনে করিও না। আমার মন ভাল ছিল না। সবিশেষ বৃত্তান্ত তোমাকে কাল প্রভাতে বলিব। আজ তুমি শয়ন কর’গে।” জয়সিং কহিলেন “যে আজ্ঞে।” বলিয়া শয়ন করিতে গেলেন। রঘুপতি সমস্ত রাত বেড়াইতে লাগিলেন।

প্রভাতে জয়সিং গুরুকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। রঘুপতি কহিলেন “জয়সিং, মায়ের বলি বন্ধ হইয়াছে।” জয়সিং বিস্মিত হইয়া কহিলেন—“সে কি কথা প্রভু?”

রঘুপতি—“রাজার এইরূপ আদেশ।”

জয়সিং—“কোন্ রাজার।”

রঘুপতি বিরক্ত হইয়া কহিলেন “এখানে রাজা আবার

কয়গণ্ডা আছে ? মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য আদেশ করিয়াছেন মন্দিরে জীব-বলি হইতে পারিবে না।"

জয়সিং—"নর বলি ?"

রঘুপতি—"আঃ, কি উৎপাত ! আমি বলিতেছি জীব বলি, তুমি শুনিতেছ নরবলি !"

জয়সিং—"কোন জীব বলিই হইতে পারিবে না !"

রঘুপতি। "না।"

জয়সিং। "মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য এইরূপ আদেশ করিয়াছেন ?"

রঘুপতি। "হাঁ গো, এক কথা কতবার বলিব !"

জয়সিং অনেকক্ষণ কিছুই বলিলেন না, কেবল আপন মনে বলিতে লাগিলেন "মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য !" গোবিন্দমাণিক্যকে জয়সিং ছেলেবেলা হইতে দেবতা বলিয়া জানিতেন। আকাশের পূর্ণচন্দ্রের প্রতি শিশুদের যেমন একপ্রকার আসক্তি আছে, গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি জয়সিংহের সেইরূপ মনের ভাব ছিল। গোবিন্দমাণিক্যের প্রশান্ত সুন্দর মুখ দেখিয়া জয়সিং প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিতেন।

রঘুপতি কহিলেন—"ইহার একটাত প্রতিবিধান করিতে হইবে !"

জয়সিংহ কহিলেন—"তা অবশ্য। আমি মহারাজের কাছে যাই, তাঁহাকে মিনতি করিয়া বলি—"

রঘুপতি—"সে বৃথা চেষ্টা।"

জয়সিংহ—"তবে কি করিতে হইবে।"

রঘুপতি কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন "সে কাল বলিব। কাল তুমি প্রভাতে কুমার নক্ষত্ররায়ের নিকটে গিয়া তাঁহাকে গোপনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিবে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রভাতে নক্ষত্ররায় আসিয়া রঘুপতিকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর কি আদেশ করেন?"

রঘুপতি কহিলেন "তোমার প্রতি মায়ের আদেশ আছে। আগে মাকে প্রণাম করিবে চল।"

উভয়ে মন্দিরে গেলেন। জয়সিংহও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। নক্ষত্ররায় ভুবনেশ্বরী প্রতিমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

রঘুপতি নক্ষত্ররায়কে কহিলেন "কুমার, তুমি রাজা হইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "আমি রাজা হইব? ঠাকুরমশায় যে কি বলেন তার ঠিক নাই!" বলিয়া নক্ষত্ররায় অত্যন্ত হাসিতে লাগিলেন।

রঘুপতি কহিলেন "আমি বলিতেছি তুমি রাজা হইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "আপনি বলিতেছেন আমি রাজা হইব?" বলিয়া রঘুপতির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

রঘুপতি কহিলেন "আমি কি মিথ্যা কথা বলিতেছি ?"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "আপনি কি মিথ্যা কথা বলিতেছেন, সে কেমন করিয়া হইবে ? দেখুন্ ঠাকুর মশায় আমি কাল ব্যাঙের স্বপ্ন দেখিয়াছি। আচ্ছা ব্যাঙের স্বপ্ন দেখিলে কি হয় বলুন দেখি !"

রঘুপতি হাস্য সম্বরণ করিয়া কহিলেন "কেমনতর ব্যাং বল দেখি ? তাহার মাথায় দাগ আছে ত ?"

নক্ষত্র সগর্ব্বে কহিলেন "তাহার মাথায় দাগ আছে বৈ কি। দাগ না থাকিলে চলিবে কেন ?"

রঘুপতি কহিলেন "বটে ! তবে ত তোমার রাজটীকা লাভ হইবে !"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "তবে আমার রাজটীকা লাভ হইবে ! আপনি বলিতেছেন আমার রাজটীকা লাভ হইবে ? আর যদি না হয় ?"

রঘুপতি কহিলেন "আমার কথা ব্যর্থ হইবে ? বল কি !"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "না না সে কথা হইতেছে না। আপনি কি না বলিতেছেন আমার রাজটীকা লাভ হইবে, মনে করুন যদিই না হয় ! দৈবাৎ কি এমন হয় না যে—"

রঘুপতি কহিলেন "না না, ইহার অন্যথা হইবে না।"

নক্ষত্ররায় "ইহার অন্যথা হইবে না। আপনি বলিতেছেন ইহার অন্যথা হইবে না। দেখুন ঠাকুর মশায়, আমি রাজা হইলে আপনাকে মন্ত্রী করিব।"

রঘুপতি "মন্ত্রিত্বের পদে আমি পদাঘাত করি।"

নক্ষত্ররায় অত্যন্ত উদার ভাবে কহিলেন "আচ্ছা জয়-সিংকে মন্ত্রী করিব।"

রঘুপতি কহিলেন "সে কথা পরে হইবে। রাজা হইবার আগে কি করিতে হইবে সেটা শোন আগে। মা রাজরক্ত দেখিতে চান, স্বপ্নে আমার প্রতি এই আদেশ হইয়াছে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "মা রাজরক্ত দেখিতে চান, স্বপ্নে আপনার প্রতি এই আদেশ হইয়াছে। এ ত বেশ কথা।"

রঘুপতি কহিলেন "তোমাকে গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত আনিতে হইবে।"

নক্ষত্ররায় খানিকটা হাঁ করিয়া রহিলেন। এ কথাটা তত "বেশ" বলিয়া মনে হইল না।

রঘুপতি তীব্রস্বরে কহিলেন "সহসা ভ্রাতৃস্নেহের উদয় হইল না কি?"

নক্ষত্ররায় কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন "হাঃ, হাঃ, ভ্রাতৃ-স্নেহ! ঠাকুর মহাশয় বেশ বলিলেন যাহোক্, ভ্রাতৃস্নেহ!"—এমন মজার কথা এমন হাসিবার কথা যেন আর হয় না! ভ্রাতৃস্নেহ! কি লজ্জার বিষয়! কিন্তু অন্তর্যামী জানেন নক্ষত্ররায়ের প্রাণের ভিতরে ভ্রাতৃস্নেহ জাগিতেছে, তাহা হাসিয়া উড়াইবার যো নাই।

রঘুপতি কহিলেন "তা হইলে কি করিবে বল।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "কি করিব বলুন!"

রঘুপতি –"কথাটা ভাল করিয়া শোন। তোমাকে গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত মায়ের দর্শনার্থ আনিতে হইবে।"

নক্ষত্ররায় মন্ত্রের মত বলিয়া গেলেন –'গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত মায়ের দর্শনার্থ আনিতে হইবে।'

রঘুপতি নিতান্ত ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিলেন –"নাঃ, তোমার দ্বারা কিছু হইবে না।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "কেন হইবে না? যাহা বলিবেন তাহাই হইবে। আপনি ত আদেশ করিতেছেন?"

রঘুপতি—"হাঁ, আমি আদেশ করিতেছি।"

নক্ষত্ররায়—"কি আদেশ করিতেছেন?"

রঘুপতি বিরক্ত হইয়া কহিলেন "মায়ের ইচ্ছা তিনি রাজরক্ত দর্শন করিবেন। তুমি গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত দেখাইয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবে এই আমার আদেশ।"

নক্ষত্ররায়—"আমি আজই গিয়া ফতেখাঁকে এই কাজে নিযুক্ত করিব।"

রঘুপতি—"না না, আর কোন লোককে ইহার বিন্দু বিসর্গ জানাইও না। কেবল জয়সিংহকে তোমার সাহায্যে নিযুক্ত করিব। কাল প্রাতে আসিও, কি উপায়ে এ কার্য্য সাধন করিতে হইবে কাল বলিব।"

নক্ষত্ররায় রঘুপতির হাত এড়াইয়া বাঁচিলেন। যত শীঘ্র পারিলেন বাহির হইয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নক্ষত্ররায় চলিয়া গেলে জয়সিংহ কহিলেন "গুরুদেব, এমন ভয়ানক কথা কখন শুনি নাই। আপনি মায়ের সম্মুখে মায়ের নাম করিয়া ভাইকে দিয়া ভ্রাতৃহত্যার প্রস্তাব করিলেন আর আমাকে তাই দাঁড়াইয়া শুনিতে হইল!"

রঘুপতি বলিলেন "আর কি উপায় আছে বল!"

জয়সিং কহিলেন—"উপায়!—কিসের উপায়!"

রঘুপতি—"তুমিও যে নক্ষত্ররায়ের মত হইলে দেখিতেছি। এতক্ষণ তবে কি শুনিলে!"

জয়সিং—"যাহা শুনিলাম তাহা শুনিবার যোগ্য নহে, তাহা শুনিলে পাপ আছে!"

রঘুপতি—"পাপ পুণ্যের তুমি কি বুঝ?"

জয়সিং—"এতকাল আপনার কাছে শিক্ষা পাইলাম পাপ পুণ্যের কিছুই বুঝি না কি?"

রঘুপতি—"শোন বৎস, তোমাকে তবে আর এক শিক্ষা দিই। পাপ পুণ্য কিছুই নাই! কেই বা পিতা, কেই বা ভ্রাতা, কেই বা কে! হত্যা যদি পাপ হয় ত সকল হত্যাই সমান। কিন্তু কে বলে হত্যা পাপ! কত পিপীলিকা আমরা প্রত্যহ পদতলে দলন করিয়া যাইতেছি, আমরা তাহাদের অপেক্ষা এমনিই কি বড়! হত্যা ত প্রতিদিনই হইতেছে। কেহ বা মাথায় একখণ্ড পাথর

পড়িয়া হত হইতেছে, কেহ বা বন্যায় ভাসিয়া গিয়া হত হইতেছে, কেহ বা মড়কের মুখে পড়িয়া হত হইতেছে, কেহ বা মনুষ্যের ছুরিকাঘাতে হত হইতেছে। এই সকল ক্ষুদ্র প্রাণীদের জীবন মৃত্যু খেলা বই ত নয়—মহাশক্তির মায়া বৈ ত নয়। কাল রূপিনী মহামায়ার নিকটে প্রতিদিন এমন কত লক্ষ-কোটি প্রাণীর বলিদান হইতেছে—জগতের চতুর্দ্দিক হইতে জীবশোণিতের স্রোত তাঁহার মহাখর্পরে আসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে—আমিই না হয় সেই স্রোতে আরেকটি কণা যোগ করিয়া দিলাম। তাঁহার বলি তিনিই এককালে গ্রহণ করিতেন, আমি না হয় মাঝখানে থাকিয়া উপলক্ষ্য হইলাম।"

তখন জয়সিংহ প্রতিমার দিকে ফিরিয়া কহিতে লাগিলেন "এই জন্যই কি তোকে সকলে মা বলে, মা! তুই এমন পাষাণী! রাক্ষসি, সমস্ত জগৎ হইতে রক্ত নিষ্পেষণ করিয়া লইয়া উদরে পূরিবার জন্য তুই ঐ লোল জিহ্বা বাহির করিয়াছিস! স্নেহ প্রেম মমতা সৌন্দর্য্য ধর্ম্ম সমস্তই মিথ্যা, সত্য কেবল তোর ঐ অনন্ত রক্ততৃষা! তোরই উদরপূরণের জন্য মানুষ মানুষের গলায় ছুরি বসাইবে, ভাই ভাইকে খুন করিবে, পিতা পুত্রে কাটাকাটি করিবে! নিষ্ঠুর, সত্য সত্যই এই যদি তোর ইচ্ছা তবে মেঘ রক্ত-বর্ষণ করে না কেন, করুণা স্বরূপিনী নদী রক্তস্রোত লইয়া রক্ত সমুদ্রে গিয়া পড়ে না কেন? তবে কেন এ জগতে

কেবল মাত্র হিংসা দ্বেষ মারী ও বিভীষিকার রাজত্ব হইল না? -না না মা, তুই প্রকাশ করিয়া বল্—এ শিক্ষা মিথ্যা, এ শাস্ত্র মিথ্যা—আমার মাকে মা বলে না সন্তানরক্তপিপাসু রাক্ষসী বলে—এ কথা আমি সহিতে পারিব না!" জয়-সিংহের চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল—তিনি নিজের কথা লইয়া নিজে ভাবিতে লাগিলেন। এত কথা ইতিপূর্ব্বে কখন তাঁহার মনে হয় নাই, রঘুপতি যদি তাঁহাকে নূতন শাস্ত্র শিক্ষা দিতে না আসিতেন তবে কখনই তাঁহার এত কথা মনেই আসিত না।

রঘুপতি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "তবে ত বলিদানের পালা একবারে উঠাইয়া দিতে হয়!"

জয়সিংহ অতি শৈশব কাল হইতে প্রতিদিন বলিদান দেখিয়া আসিতেছেন এই জন্য মন্দিরে যে বলিদান কোন কালে বন্ধ হইতে পারে কিম্বা বন্ধ হওয়া উচিত এ কথা কিছুতেই তাঁহার মনে লাগে না। এমন কি এ কথা মনে করিতে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগে এই জন্য রঘুপতির কথার উত্তরে জয়সিং কহিলেন "সে স্বতন্ত্র কথা। তাহার অন্য কোন অর্থ আছে। তাহাতে ত কোন পাপ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ভাইকে ভাই হত্যা করিবে! তাই বলিয়া মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যকে—প্রভু, আপনার পায়ে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করি, আমাকে প্রবঞ্চনা করিবেন না, সত্যই কি মা স্বপ্নে কহিয়াছেন—রাজরক্ত নহিলে তাঁর তৃপ্তি হইবে না?"

রঘুপতি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—"সত্য নহিলে কি মিথ্যা কহিতেছি? তুমি কি আমাকে অবিশ্বাস কর?"

জয় সিংহ রঘুপতির পদধূলি লইয়া কহিলেন—"গুরুদেবের প্রতি আমার বিশ্বাস শিথিল না হয় যেন! কিন্তু নক্ষত্ররায়েরও ত রাজকুলে জন্ম!"

রঘুপতি কহিলেন—"দেবতাদের স্বপ্ন ইঙ্গিত মাত্র; সকল কথা শুনা যায় না, অনেকটা বুঝিয়া লইতে হয়। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি দেবীর অসন্তোষ হইয়াছে, অসন্তোষের সম্পূর্ণ কারণও জন্মিয়াছে। অতএব দেবী যখন রাজরক্ত চাহিয়াছেন তখন বুঝিতে হইবে তাহা গোবিন্দ মাণিক্যেরই রক্ত।"

জয়সিং কহিলেন—"তা যদি সত্য হয় তবে আমিই রাজরক্ত আনিব—নক্ষত্ররায়কে পাপে লিপ্ত করিব না।"

রঘুপতি কহিলেন—"দেবীর আদেশ পালন করিতে কোন পাপ নাই।"

জয়সিং—"পুণ্য আছেত প্রভু! সে পুণ্য আমিই উপার্জ্জন করিব।"

রঘুপতি কহিলেন—"তবে সত্য করিয়া বলি বৎস। আমি তোমাকে শিশুকাল হইতে পুত্রের অধিক যত্নে প্রাণের অধিক ভাল বাসিয়া পালন করিয়া আসিয়াছি, আমি তোমাকে হারাইতে পারিব না। নক্ষত্ররায় যদি

গোবিন্দমাণিক্যকে বধ করিয়া রাজা হয় তবে কেহ তাহাতে একটি কথা কহিবে না—কিন্তু তুমি যদি রাজার গাত্রে হাত তোল ত তোমাকে আর আমি ফিরিয়া পাইব না।”

জয়সিং কহিলেন—“আমার স্নেহে! পিতা, আমি অপদার্থ, আমার স্নেহে তুমি একটি পিপীলিকারও হানি করিতে পাইবে না। আমার প্রতি স্নেহে তুমি যদি পাপে লিপ্ত হও তবে তোমার সে স্নেহ আমি বেশি দিন ভোগ করিতে পারিব না, সে স্নেহের পরিণাম কখনই ভাল হইবে না।”

রঘুপতি তাড়াতাড়ি কহিলেন “আচ্ছা, আচ্ছা, সে কথা পরে হইবে। কাল নক্ষত্ররায় আসিলে যা হয় একটা ব্যবস্থা হইবে!”

জয়সিং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন—“আমিই রাজরক্ত আনিব। মায়ের নামে, গুরুদেবের নামে ভ্রাতৃহত্যা ঘটিতে দিব না!”

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জয়সিংহের সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। গুরুর সহিত যে কথা লইয়া আলোচনা হইয়াছিল দেখিতে দেখিতে তাহার শাখা প্রশাখা বাহির হইতে লাগিল। অধিকাংশ সময়েই আরম্ভ আমাদের আয়ত্তাধীন, শেষ আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। চিন্তা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। জয়সিংহের মনে অনিবার্য্যবেগে এমন সকল কথা উঠিতে

লাগিল যাহা তাঁহার অশৈশব বিশ্বাসের মূলে অবিশ্রাম আঘাত করিতে লাগিল। জয়সিং পীড়িত ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃস্বপ্নের মত ভাবনা কিছুতেই ক্ষান্ত হইতে চায় না। যে কালীকে জয়সিং এতদিন মা বলিয়া জানিতেন গুরুদেব আজ কেন তাঁহার মাতৃত্ব অপহরণ করিলেন, কেন তাঁহাকে হৃদয়হীন শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন! শক্তির সন্তোষই কি আর অসন্তোষই কি! শক্তির চক্ষুই বা কোথায় কর্ণই বা কোথায়! শক্তি ত মহারথের ন্যায় তাহার সহস্র চক্রের তলে জগৎ কর্ষিত করিয়া ঘর্ঘর শব্দে চলিয়া যাইতেছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া কে চলিল, তাহার তলে পড়িয়া কে চূর্ণ হইল, তাহার উপরে উঠিয়া কে উৎসব করিতেছে, তাহার নিম্নে পড়িয়া কে আর্ত্তনাদ করিতেছে, সে তাহার কি জানিবে!—তাহার সারথী কি কেহ নাই? পৃথিবীর নিরীহ অসহায় ভীরু জীবদিগের রক্ত বাহির করিয়া কালরূপিনী নিষ্ঠুর শক্তির তৃষা নির্ব্বাণ করিতে হইবে এই কি আমার ব্রত! কেন? সে ত আপনার কাজ আপনিই করিতেছে—তাহার দুর্ভিক্ষ আছে, বন্যা আছে, ভূমিকম্প আছে, জরা মারী অগ্নিদাহ আছে, নির্দ্দয় মানবহৃদয়স্থিত হিংসা আছে, ক্ষুদ্র আমাকে তাহার আবশ্যক কি!

তাহার পরদিন যে প্রভাত হইল তাহা অতি মনোহর প্রভাত। বৃষ্টি শেষ হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে মেঘ নাই।

সূর্য্যকিরণ যেন বর্ষার জলে ধৌত ও স্নিগ্ধ। বৃষ্টিবিন্দু ও সূর্য্য কিরণে দশদিক ঝলমল করিতেছে। শুভ্র আনন্দপ্রভা আকাশে প্রান্তরে অরণ্যে নদীস্রোতে বিকশিত শ্বেত শত-দলের ন্যায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নীল আকাশে চীল ভাসিয়া যাইতেছে—ইন্দ্রধনুর তোরণের নীচে দিয়া বকের শ্রেণী উড়িয়া চলিয়াছে। কাঠবিড়ালীরা গাছে গাছে ছুটাছুটি করিতেছে! দুই একটি অতি ভীরু খরগোষ সচকিতে ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আবার আড়াল খুঁজিতেছে। ছাগশিশুরা অতি দুর্গম পাহাড়ে উঠিয়া ঘাস ছিঁড়িয়া খাইতেছে। গরুগুলি আজ মনের আনন্দে মাঠময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রাখাল গান ধরিয়াছে। কলসকক্ষ মায়ের আঁচল ধরিয়া আজ ছেলে মেয়েরা বাহির হইয়াছে। বৃদ্ধ পূজার জন্য ফুল তুলিতেছে। স্নানের জন্য নদীতে আজ অনেক লোক সমবেত হইয়াছে, কলকল স্বরে তাহারা গল্প করিতেছে—নদীর কলধ্বনিরও বিরাম নাই। আষাঢ়ের প্রভাতে এই জীবময়ী আনন্দময়ী ধরণীর দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জয়সিং মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

জয়সিং প্রতিমার দিকে চাহিয়া যোড়হস্তে কহিলেন—"কেন মা, আজ এমন অপ্রসন্ন কেন? এক দিন তোমার জীবের রক্ত তুমি দেখিতে পাও নাই বলিয়া এত ভ্রুকুটী! আমাদের হৃদয়ের মধ্যে চাহিয়া দেখ, ভক্তির কি কিছু

অভাব দেখিতেছ? ভক্তের হৃদয় পাইলেই কি তোমার তৃপ্তি হয় না, নিরপরাধীর শোণিত চাই? আচ্ছা মা, সত্য করিয়া বল্ দেখি, পুণ্যের শরীর গোবিন্দমাণিক্যকে পৃথিবী হইতে অপসৃত করিয়া এখানে দানবের রাজত্ব স্থাপন করাই কি তোর অভিপ্রায়? রাজরক্ত কি নিতান্তই চাই? তোর মুখের উত্তর না শুনিলে আমি কখনই রাজহত্যা ঘটিতে দিব না, আমি ব্যাঘাত করিব। বল্, হাঁ কি না!"

সহসা বিজন মন্দিরে শব্দ উঠিল "হাঁ"। জয়সিং চমকিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, মনে হইল যেন ছায়ার মত কি একটা কাঁপিয়া গেল। স্বর শুনিয়া প্রথমেই তাঁহার মনে হইয়াছিল যেন তাঁর গুরুর কণ্ঠস্বর। পরে মনে করিলেন মা তাঁহাকে তাঁহার গুরুর কণ্ঠস্বরেই আদেশ করিলেন ইহাই সম্ভব। তাঁহার গাত্র লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রতিমাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া সশস্ত্রে বাহির হইয়া পড়িলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গোমতী নদীর দক্ষিণদিকের এক স্থানের পাড় অতিশয় উচ্চ। বর্ষার ধারা ও ছোট ছোট স্রোত এই উন্নত ভূমিকে নানা গুহা গহ্বরে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার কিছু দূরে প্রায় অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে বড় বড় শাল ও

গাম্ভারি গাছে এই শতধা বিদীর্ণ ভূমি খণ্ডকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু মাঝ খানের এই জমি টুকুর মধ্যে বড় গাছ একটিও নাই। কেবল স্থানে স্থানে ঢিপির উপর ছোট ছোট শাল গাছ বাড়িতে পারিতেছে না, বাঁকিয়া কালো হইয়া পড়িয়াছে। বিস্তর পাথর ছড়ানো। এক হাত দুই হাত প্রশস্ত ছোট ছোট জলস্রোত কত শত আঁকা-বাঁকা পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া মিলিয়া বিভক্ত হইয়া, নদীতে গিয়া পড়িতেছে। এই স্থান অতি নির্জ্জন—এখানকার আকাশ গাছের দ্বারা অবরুদ্ধ নহে। এখান হইতে গোমতী নদী এবং তাহার পরপারের বিচিত্র বর্ণ শস্যক্ষেত্র সকল অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। প্রতি দিন প্রাতে রাজা গোবিন্দমাণিক্য এইখানে বেড়াইতে আসিতেন, সঙ্গে একটি সঙ্গী বা একটী অনুচরও আসিত না। জেলেরা কখন কখন গোমতীতে মাছ ধরিতে আসিয়া দূর হইতে দেখিতে পাইত, তাহাদের সৌম্যমূর্ত্তি রাজা যোগীর ন্যায় স্থিরভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখে প্রভাতের জ্যোতি কি তাঁহার আত্মার জ্যোতি বুঝা যাইত না। আজকাল বর্ষার দিনে প্রতিদিন এখানে আসিতে পারিতেন না কিন্তু বর্ষা উপশমে যে দিন আসিতেন সে দিন ছোট তাতাকে সঙ্গে করিয়া আনিতেন।

তাতাকে আর তাতা বলিতে ইচ্ছা করে না। একমাত্র যাহার মুখে তাতা সম্বোধন মানাইত সে ত আর নাই।

পাঠকদের কাছে তাতা শব্দের কোন অর্থই নাই—কিন্তু হাসি যখন সকাল বেলায় শালবনে দুষ্টুমি করিয়া শাল-গাছের আড়ালে লুকাইয়া তাহার সুমিষ্ট তীক্ষ্ণস্বরে "তাতা" বলিয়া ডাকিত এবং তাহার উত্তরে গাছে গাছে দোয়েল ডাকিয়া উঠিত—দূর কানন হইতে প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিত তখন সেই তাতা শব্দ অর্থে পরিপূর্ণ হইয়া কানন ব্যাপ্ত করিত, তখন সেই তাতা সম্বোধন একটি বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ের অতি কোমল স্নেহনীড় পরিত্যাগ করিয়া পাখীর মত স্বর্গের দিকে উড়িয়া যাইত—তখন সেই একটি স্নেহ-সিক্ত মধুর সম্বোধন প্রভাতের সমুদয় পাখীর গান লুটিয়া লইত—প্রভাত-প্রকৃতির আনন্দময় সৌন্দর্য্যের সহিত একটি ক্ষুদ্র বালিকার আনন্দময় স্নেহের ঐক্য দেখাইয়া দিত। এখন সে বালিকা নাই—বালকটি আছে কিন্তু "তাতা" নাই, বালকটি এ সংসারের সহস্র লোকের, সহস্র বিষয়ের, কিন্তু "তাতা" কেবলমাত্র সেই বালিকারই।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য এই বালককে ধ্রুব বলিয়া ডাকিতেন আমরাও তাহাই বলিয়া ডাকিব।

মহারাজ পূর্ব্বে একা গোমতী তীরে আসিতেন, এখন ধ্রুবকে সঙ্গে করিয়া আনেন। তাহার পবিত্র সরল মুখচ্ছ-বিতে তিনি দেবলোকের ছায়া দেখিতে পান। মধ্যাহ্নে সংসারের আবর্ত্তের মধ্যে রাজা যখন প্রবেশ করেন তখন বৃদ্ধ বিজ্ঞ মন্ত্রীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়, তাঁহাকে পরামর্শ

দেয়—আর প্রভাত হইলে একটি শিশু তাঁহাকে সংসারের বাহিরে লইয়া আসে—তাহার বড় বড় দুটি নীরব চক্ষের সম্মুখে বিষয়ের সহস্র কুটিলতা সঙ্কুচিত হইয়া যায়—শিশুর হাত ধরিয়া মহারাজ বিশ্বজগতের মধ্যবর্ত্তী অনন্তের দিকে প্রসারিত একটি উদার সরল বিস্তৃত রাজপথে গিয়া দাঁড়ান; সেখানে অনন্ত সুনীল আকাশ-চন্দ্রাতপের নিম্নস্থিত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মহাসভা দেখিতে পাওয়া যায়; সেখানে ভূলোক ভুবলোক স্বর্লোক সপ্তলোকের সঙ্গীতের আভাস শুনা যায়, সেখানে সরল পথে সকলই সরল সহজ শোভন বলিয়া বোধ হয়, কেবলই অগ্রসর হইতে উৎসাহ হয়—উৎকট ভাবনা চিন্তা অসুখ অশান্তি দূর হইয়া যায়। মহারাজ সেই প্রভাতে নির্জ্জনে বনের মধ্যে, নদীর তীরে, মুক্ত আকাশে একটি শিশুর প্রেমে নিমগ্ন হইয়া অসীম প্রেম সমুদ্রের পথ দেখিতে পান।

গোবিন্দমাণিক্য ধ্রুবকে কোলে করিয়া লইয়া তাহাকে ধ্রুবোপাখ্যান শুনাইতেছেন সে যে বড় একটা কিছু বুঝিতেছে তাহা নহে—কিন্তু রাজার ইচ্ছা ধ্রুবের মুখে আধ আধ স্বরে এই ধ্রুবোপাধ্যান আবার ফিরিয়া শুনেন।

গল্প শুনিতে শুনিতে ধ্রুব বলিল—"আমি বনে যাব।"

রাজা বলিলেন—"কি কর্ত্তে বনে যাবে?"

ধ্রুব বলিল—"হরিকে দেখ্‌তে যাব।"

রাজা বলিলেন—"আমরাত বনে এসেছি, হরিকে দেখ্‌তে এসেছি।"

ধ্রুব—"হরি কোথায়!"

রাজা—"এই খানেই আছেন।"

ধ্রুব কহিল—"দিদি কোথায়!" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া পিছনে চাহিয়া দেখিল—তাহার মনে হইল দিদি যেন আগেকার মত পিছন হইতে সহসা তাহার চোখ টিপিবার জন্য আসিতেছে, কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া ঘাড় নামাইয়া চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "দিদি কোথায়।"

রাজা কহিলেন—"হরি তোমার দিদিকে ডেকে নিয়েচেন।

ধ্রুব কহিল—"হরি কোথায়!"

রাজা কহিলেন—"তাঁকে ডাক বৎস। তোমাকে সেই যে শ্লোক শিখিয়ে দিয়েছিলেম সেইটে বল।"

ধ্রুব তুলিয়া তুলিয়া বলিতে লাগিল।

হরি তোমায় ডাকি—বালক একাকী,
আঁধার অরণ্যে ধাই হে।
গহন তিমিরে নয়নের নীরে
পথ খুঁজে নাহি পাইহে।
সদা মনে হয় কি করি কি করি,
কখন আসিবে কাল-বিভাবরী,
তাই ভয়ে মরি ডাকি হরি হরি
হরি বিনা কেহ নাই হে।

নয়নের জল হবে না বিফল,
তোমায় সবে বলে ভকত বৎসল,
সেই আশা মনে করেছি সম্বল,
বেঁচে আছি আমি তাই হে।
আঁধারেতে জাগে তোমার আঁখিতারা,
তোমার ভক্ত কভু হয় না পথহারা,
ধ্রুব তোমায় চাহে তুমি ধ্রুবতারা
আর কার পানে চাই হে॥

"র"য়ে "ল"য়ে "ড"য়ে "দ"য়ে উলট্ পালট্ করিয়া অর্দ্ধেক কথা মুখের মধ্যে রাখিয়া অর্দ্ধেক কথা উচ্চারণ করিয়া ধ্রুব দুলিয়া সুধাময় কণ্ঠে এই শ্লোক পাঠ করিল। শুনিয়া রাজার প্রাণ আনন্দে নিমগ্ন হইয়া গেল। প্রভাত দ্বিগুণ মধুর হইয়া উঠিল। চারিদিকে নদীকানন তরুলতা হাসিতে লাগিল। কনক সুধাসিক্ত নীলাকাশে তিনি কাহার অনুপম সুন্দর সহাস্য মুখচ্ছবি দেখিতে পাইলেন। ধ্রুব যেমন তাঁহার কোলে বসিয়া আছে—তাঁহাকেও তেমনি কে যেন বাহুপাশের মধ্যে কোলের মধ্যে তুলিয়া লইল। তিনি আপনাকে, আপনার চারিদিকের সকলকে, বিশ্বচরাচরকে কাহার কোলের উপর দেখিতে পাইলেন। তাঁহার আনন্দ ও প্রেম সূর্য্যকিরণের ন্যায় দশদিকে বিকীরিত হইয়া আকাশ পূর্ণ করিল।

এমন সময়ে সশস্ত্র জয়সিং গুহাপথ দিয়া সহসা রাজার সম্মুখে আসিয়া উত্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে দুইহাত বাড়াইয়া দিলেন, কহিলেন, "এস, জয়সিং, এস।" রাজা তখন শিশুর সহিত মিশিয়া শিশু হইয়াছেন, তাঁহার রাজ-মর্য্যাদা কোথায়! জয়সিং রাজাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। রাজা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন—"জয়সিং তুমিইত আমার প্রণম্য। তোমার রাজবংশে জন্ম, তুমি ক্ষত্রিয়।"

জয়সিং কহিলেন—"মহারাজ এক নিবেদন আছে।"

রাজা কহিলেন—"কি বল।

জয়সিংহ—"মা আপনার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন!"

রাজা—"কেন, আমি তাঁর অসন্তোষের কাজ কি করিয়াছি?"

জয়সিংহ—"মহারাজ বলি বন্ধ করিয়া দেবীর পূজার ব্যাঘাত করিয়াছেন।"

রাজা বলিয়া উঠিলেন—"কেন, জয়সিং—কেন এ হিংসার লালসা! আজি এই সুমধুর প্রভাতে কেন এ হিংসার উচ্ছাস! চাহিয়া দেখদেখি, মায়ের কোলে সমুদয় জীবজন্তু কি আরামে নিঃশঙ্কে আনন্দে বিচরণ করিতেছে, ঐ কোলে ত্রাস শোক হাহাকার তুলিয়া ঐ মাতৃক্রোড়ে সন্তানের রক্তপাত করিয়া তুমি মাকে প্রসন্ন কবিতে চাও! জগতের শান্তিনাশ করিতে কেন এত বাসনা! কেন হিংসা

বিষকণ্টকের মূলে জীবশোণিত ঢালিয়া তাহাকে সযত্নে বর্দ্ধিত করিতেছ! কোথায় করুণার কল্পতরু, কোথায় প্রেমের পারিজাত!”

জয়সিং ধীরে ধীরে রাজার পায়ের কাছে বসিলেন। ধ্রুব তাঁহার তলোয়ার লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

জয়সিং কহিলেন—“কেন মহারাজ, শাস্ত্রেত বলিদানের ব্যবস্থা আছে!”

রাজা কহিলেন “শাস্ত্রের যথার্থ বিধি কেই বা পালন করে! আপনার প্রবৃত্তি অনুসারে সকলেই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে!—যখন কালীর সম্মুখে আর্ত্ত অসহায় জীবের বলিদান হয়, সেই বলির সকর্দ্দম রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া যখন সকলে উৎকট চীৎকারে ভীষণ উল্লাসে প্রাঙ্গনে নৃত্য করিতে থাকে তখন কি তাহারা মায়ের পূজা করে! না নিজের হৃদয়ের মধ্যে যে হিংসা রাক্ষসী আছে সেই রাক্ষসীটার পূজা করে, সেই রাক্ষসীকে মা বলে, সেই রাক্ষসীটাকে রক্ত খাওয়াইয়া পরিপুষ্ট করিয়া তোলে! হিংসার নিকটে বলিদান দেওয়া শাস্ত্রের বিধি নহে, হিংসাকে বলি দেওয়াই শাস্ত্রের বিধি।”

জয়সিংহ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। কল্যরাত্রি হইতে তাঁহার মনেও এমন অনেক কথা তোলপাড় হইয়াছে। অবশেষে বলিলেন “আমি মায়ের স্বমুখে শুনিয়াছি—এ বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকিতে পারে না।

তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন তিনি মহারাজের রক্ত চান।” বলিয়া জয়সিং প্রভাতের মন্দিরের ঘটনা রাজাকে বলিলেন। রাজা হাসিয়া বলিলেন “এ ত মায়ের আদেশ নয় এ রঘুপতির আদেশ। রঘুপতিই অন্তরাল হইতে তোমার কথার উত্তর দিয়াছিলেন!”

রাজার মুখে এই কথা শুনিয়া জয়সিং একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনেও এইরূপ সংশয় একবার চকিতের মত উঠিয়াছিল কিন্তু আবার বিদ্যুতের মত অন্তর্হিত হইয়াছিল। রাজার কথায় সেই সন্দেহে আবার আঘাত লাগিল। জয়সিংহ অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিয়া উঠিলেন “না মহারাজ, আমাকে ক্রমাগত সংশয় হইতে সংশয়ান্তরে লইয়া যাইবেন না—আমাকে তীর হইতে ঠেলিয়া সমুদ্রে ফেলিবেন না—আপনার কথায় আমার চারিদিকের অন্ধকার কেবল বাড়িতেছে। আমার যে বিশ্বাস যে ভক্তি ছিল তাই থাক্—তাহার পরিবর্ত্তে এ কুয়াশা আমি চাই না। মায়ের আদেশই হউক্ আর গুরুর আদেশই হউক্ সে একই কথা—আমি পালন করিব।” বলিয়া বেগে উঠিয়া তাঁহার তলোয়ার খুলিলেন—তলোয়ার রৌদ্রকিরণে বিদ্যুতের মত চক্‌মক্ করিয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া ধ্রুব ঊর্দ্ধস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—তাহার ছোট্ট দুইটি হাতে রাজাকে জড়াইয়া রাজাকে প্রাণপণে আচ্ছাদন করিয়া ধরিল—রাজা জয়-

সিংহের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ধ্রুবকেই বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

জয়সিং তলোয়ার দূরে ফেলিয়া দিলেন। ধ্রুবের পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন "কোন ভয় নেই বৎস, কোন ভয় নেই। আমি এই চলিলাম। তুমি ঐ মহৎ আশ্রয়ে থাক ঐ বিশাল বক্ষে বিরাজ কর—তোমাকে কেহ বিচ্ছিন্ন করিবে না।" বলিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। সহসা আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন—"মহারাজকে সাবধান করিয়া দিই— আপনার ভ্রাতা নক্ষত্ররায় আপনাকে বিনাশের পরামর্শ করিয়াছেন। ২৯শে আষাঢ় চতুর্দ্দশ দেবতার পূজার রাত্রে আপনি সতর্ক থাকিবেন।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন "নক্ষত্র কোন মতেই আমাকে বধ করিতে পারিবে না, সে আমাকে ভালবাসে।" জয়সিং বিদায় হইয়া গেলেন।

রাজা ধ্রুবের দিকে চাহিয়া ভক্তিভাবে কহিলেন "তুমিই আজ রক্তপাত হইতে ধরণীকে রক্ষা করিলে, সেই উদ্দেশেই তোমার দিদি তোমাকে রাখিয়া গিয়াছেন।" বলিয়া ধ্রুবের অশ্রুসিক্ত দুইটি কপোল মুছাইয়া দিলেন।

ধ্রুব গম্ভীর মুখে কহিল "দিদি কোথায়।"

এমন সময়ে মেঘ আসিয়া সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; নদীর উপর কালো ছায়া পড়িল। দূরের বনান্ত

মেঘের মতই কালো হইয়া উঠিল। বৃষ্টিপাতের লক্ষণ দেখিয়া রাজা প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

মন্দির অনেক দূরে নয়। কিন্তু জয়সিং বিজন নদীর ধার দিয়া অনেক ঘুরিয়া ধীরে ধীরে মন্দিরেব দিকে চলি-লেন। বিস্তর ভাবনা তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। এক জায়গায় নদীর তীরে গাছের তলায় বসিয়া পড়িলেন। দুই হস্তে মুখ আচ্ছাদন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছি অথচ সংশয় যাইতেছে না। আজ হইতে কেই বা আমার সংশয় ঘুচাইবে। কোনটা ভাল কোন্‌টা মন্দ আজ হইতে কে তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিবে? সংসারের সহস্র কোটি পথের মোহানায় দাঁড়াইয়া কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব কোন্‌টা যথার্থ পথ! প্রান্তরের মধ্যে আমি অন্ধ একাকী দাঁড়াইয়া আছি আজ আমার যষ্টি ভাঙ্গিয়া গেছে!" জয় সিং যখন উঠিলেন তখন বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে মন্দিরের দিকে চলিলেন। দেখিলেন বিস্তর লোক কোলা-হল করিতে করিতে মন্দিরের দিক হইতে দল বাঁধিয়া চলিয়া আসিতেছে।

বুড়া বলিতেছে—"বাপ পিতামহর কাল থেকে এই ত

চলে আস্‌চে জানি আজ রাজার বুদ্ধি কি তাঁদের সকলকেই ছাড়িয়ে উঠ্‌ল!"

যুবা বলিতেছে—"এখন আর মন্দিরে আস্‌তে ইচ্ছে করে না, পূজার সে ধুম নেই।"

কেহ কহিল—"এ যেন নবাবের রাজত্ব হয়ে দাঁড়াল।" তাহার মনের ভাব এই যে বলিদান সম্বন্ধে দ্বিধা একজন মুসলমানের মনেই জন্মাইতে পারে কিন্তু একজন হিন্দুর মনে জন্মান অত্যন্ত আশ্চর্য্য।

মেয়েরা বলিতে লাগিল—"এ রাজ্যের মঙ্গল হবে না।"

একজন কহিল "পুরুত ঠাকুর ত স্বয়ং বল্লেন যে মা স্বপ্নে বলেছেন তিন মাসের মধ্যে এ দেশ মড়কে উচ্ছন্ন যাবে।"

হারু বলিল "এই দেখ না কেন, মোধো আজ দেড় বৎসর ধরে ব্যাম ভুগে বরাবর বেঁচে এসেছে, বলি বন্ধ হল অম্‌নি সে মারা গেল!"

ক্ষান্ত বলিল—"তা কেন, আমার ভাসুরপো, সে যে মর্‌বে এ কে জান্‌ত! তিন দিনের জ্বর। যেমন কবিরাজের বড়িটি খাওয়া অমনি চোখ উল্‌টে গেল!" ভাসুরপোর শোকে এবং রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় ক্ষান্ত কাতর হইয়া পড়িল।

তিনকড়ি কহিল—"সে দিন মধুরহাটির গঞ্জে আগুন লাগ্‌ল একখানা চালা বাকি রইল না।"

চিন্তামণি চাষা তাহার একজন সঙ্গী চাষাকে কহিল

"অত কথায় কাজ কি, দেখ না কেন এ বছর যেমন ধান শস্তা হয়েছে এমন অন্য কোন বছর হয়নি। এ বছর চাষার কপালে কি আছে কে জানে!"

বলিদান বন্ধ হইবার পরে এবং পূর্ব্বেও যাহার যাহা কিছু ক্ষতি হইয়াছে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহার একমাত্র কারণ নির্দ্দিষ্ট হইল। এদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই ভাল এইরূপ সকলের মত হইল। এ মত কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইল না বটে কিন্তু দেশেই সকলে বাস করিতে লাগিল।

জয়সিং অন্যমনস্ক ছিলেন ইহাদের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া তিনি মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন পূজা শেষ করিয়া রঘুপতি মন্দিরের বাহিরে বসিয়া আছেন।

দ্রুতগতি রঘুপতির নিকটে গিয়াই জয়সিং কাতর অথচ দৃঢ়স্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গুরুদেব, মায়ের আদেশ গ্রহণ করিবার জন্য আজ প্রভাতে আমি যখন মাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি কেন তাহার উত্তর দিলেন?"

রঘুপতি একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন—"মা ত আমার দ্বারাই তাঁহার আদেশ প্রচার করিয়া থাকেন, তিনি নিজমুখে কিছু বলেন না।"

জয়সিং কহিলেন—"আপনি সম্মুখে উপস্থিত হইয়া

বলিলেন না কেন? অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া আমাকে ছলনা করিলেন কেন?”

রঘুপতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন “চুপ কর! আমি কি ভাবিয়া কি করি তুমি তাহার কি বুঝিবে? বাচালের মত যাহা মুখে আসে তাহাই বলিও না। আমি যাহা আদেশ করিব তুমি কেবল তাহাই পালন করিবে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না!”

জয়সিং চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার সংশয় বাড়িল বৈ কমিল না। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন “আজ প্রাতে আমি মায়ের কাছে বলিয়াছিলাম যে তিনি যদি স্বমুখে আমাকে আদেশ না করেন তবে আমি কখনই রাজহত্যা ঘটিতে দিব না, তাহার ব্যাঘাত করিব। যখন স্থির বুঝিলাম মা আদেশ করেন নাই তখন মহারাজার নিকট নক্ষত্ররায়ের সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া দিতে হইল, তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলাম।”

রঘুপতি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। উদ্বেলিত ক্রোধ দমন করিয়া দৃঢ়স্বরে জয়সিংহকে বলিলেন “মন্দিরে প্রবেশ কর।”

উভয়ে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন!

রঘুপতি কহিলেন “মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ কর—বল যে ২৯শে আষাঢ়ের মধ্যে আমি রাজরক্ত আনিয়া এই চরণে উপহার দিব।”

জয়সিং ঘাড় হেঁট করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে একবার গুরুর মুখের দিকে একবার প্রতিমার মুখের দিকে চাহিলেন। প্রতিমা স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "২৯শে আষাঢ়ের মধ্যে আমি রাজরক্ত আনিয়া এই চরণে উপহার দিব।"

দশম পরিচ্ছেদ।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মহারাজ নিয়মিত রাজকার্য্য সমাপন করিলেন। প্রাতঃকালের সূর্য্যালোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে। মেঘের ছায়ায় দিন আবার অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। মহারাজ অত্যন্ত বিমনা আছেন। অন্যদিন রাজসভায় নক্ষত্ররায় উপস্থিত থাকিতেন, আজ তিনি উপস্থিত ছিলেন না। রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন তিনি ওজর করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার শরীর অসুস্থ। রাজা স্বয়ং নক্ষত্ররায়ের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নক্ষত্র মুখ তুলিয়া রাজার মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না। একখানা লিখিত কাগজ লইয়া কাজে ব্যস্ত আছেন এমনি ভান করিলেন। রাজা বলিলেন "নক্ষত্র, তোমার কি অসুখ করিয়াছে?"

নক্ষত্র কাগজের এপিঠ ওপিঠ উল্টাইয়া হাতের অঙ্গুরী নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন "অসুখ? না, অসুখ ঠিক

নয়—এই, একটুখানি কাজ ছিল—হাঁ হাঁ অসুখ হয়েছিল—কতকটা অসুখের মতন বটে।”

নক্ষত্ররায় নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন, গোবিন্দমাণিক্য অতিশয় বিষণ্ণ মুখে নক্ষত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—হায় হায়, স্নেহের নীড়ের মধ্যেও হিংসা ঢুকিয়াছে, সে সাপের মত লুকাইতে চায়, মুখ দেখাইতে চায় না। আমাদের অরণ্যে কি হিংস্র পশু যথেষ্ট নাই—শেষে কি মানুষও মানুষকে ভয় করিবে, ভাইও ভাইয়ের পাশে গিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বসিতে পাইবে না? এই আমার ভাই ইহার সহিত প্রতিদিন এক গৃহে বাস করি, একাসনে বসিয়া থাকি, হাসিমুখে কথা কই—এও আমার পাশে বসিয়া মনের মধ্যে ছুরি শানাইতেছে!—গোবিন্দমাণিক্যের নিকট তখন সংসার হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যের মত বোধ হইতে লাগিল। ঘন অন্ধকারের মধ্যে কেবল চারিদিকে দন্ত ও নখরের ছটা দেখিতে পাইলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মহারাজ মনে করিলেন এই স্নেহপ্রেমহীন হানাহানির রাজ্যে বাঁচিয়া থাকিয়া আমি আমার স্বজাতির আমার ভাইদের মনে কেবল হিংসা লোভ ও দ্বেষের অনল জ্বালাইতেছি—আমার সিংহাসনের চারিদিকে আমার প্রাণাধিক আত্মীয়েরা আমার দিকে চাহিয়া মনে মনে মুখ বক্র করিতেছে, দন্ত ঘর্ষণ করিতেছে, শৃঙ্খলবদ্ধ ভীষণ কুক্কুরের মত চারিদিক

হইতে আমার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িবার অবসর খুঁজি-তেছে। “ইহা অপেক্ষা ইহাদের খর নখরাঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহাদের রক্তের তৃষা মিটাইয়া এখান হইতে অপসৃত হওয়াই ভাল! প্রভাত-আকাশে গোবিন্দ-মাণিক্য যে প্রেম মুখচ্ছবি দেখিয়া ছিলেন তাহা কোথায় মিলাইয়া গেল!

উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহারাজ গম্ভীরস্বরে বলিলেন “নক্ষত্র, আজ অপরাহ্নে গোমতী তীরের নির্জ্জন অরণ্যে আমরা দুই জনে বেড়াইতে যাইব।”

রাজার এই গম্ভীর আদেশবাণীর বিরুদ্ধে নক্ষত্রের মুখে কথা সরিল না, কিন্তু সংশয়ে ও আশঙ্কায় তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল মহারাজ এতক্ষণ নীরবে দুই চক্ষু তাঁহারই মনের দিকে নিবিষ্ট করিয়া বসিয়াছিলেন—সেখানে অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে যে ভাবনা গুলো কীটের মত কিল্‌বিল্‌ করিতেছিল সে গুলো যেন সহসা আলো দেখিয়া অস্থির হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভয়ে ভয়ে নক্ষত্ররায় রাজার মুখের দিকে একবার চাহিলেন—দেখিলেন তাঁহার মুখে কেবল সুগভীর বিষণ্ণ শান্তির ভাব, সেখানে রোষের রেখা মাত্র নাই। মানবহৃদয়ের কঠিন নিষ্ঠুরতা দেখিয়া কেবল সুগভীর শোক তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল।

বেলা পড়িয়া আসিল। তখনও মেঘ করিয়া আছে। নক্ষত্ররায়কে সঙ্গে লইয়া মহারাজ পদব্রজে অরণ্যের দিকে

চলিলেন। এখনও সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে, কিন্তু মেঘের অন্ধকারে সন্ধ্যা বলিয়া ভ্রম হইতেছে—কাকেরা অরণ্যের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া অবিশ্রাম চীৎকার করিতেছে—কিন্তু দুই একটা চিল এখনও আকাশে সাঁতার দিতেছে। দুই ভাই যখন নির্জ্জন বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন নক্ষত্ররায়ের গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। বড় বড় প্রাচীন গাছ জটলা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহারা একটি কথা কহে না, কিন্তু স্থির হইয়া যেন কীটের পদশব্দটুকু পর্য্যন্তও শোনে, তাহারা কেবল নিজের ছায়ার দিকে, তলস্থিত অন্ধকারের দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকে। অরণ্যের সেই জটিল রহস্যের ভিতরে পদক্ষেপ করিতে নক্ষত্ররায়ের পা যেন আর উঠে না—চারিদিকে সুগভীর নিস্তব্ধতার ভ্রূকুটি দেখিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হইতে লাগিল। নক্ষত্র-রায়ের অত্যন্ত সন্দেহ ও ভয় জন্মিল। ভীষণ অদৃষ্টের মত নীরব রাজা এই সন্ধ্যাকালে এই পৃথিবীর অন্তরাল দিয়া তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন কিছুই ঠাহর পাইলেন না। নিশ্চয় মনে করিলেন রাজার কাছে ধরা পড়িয়াছেন—এবং গুরুতর শাস্তি দিবার জন্যই রাজা তাঁহাকে এই অরণ্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। নক্ষত্ররায় ঊর্দ্ধ-শ্বাসে পালাইতে পারিলে বাঁচেন, কিন্তু মনে হইল কে যেন তাঁহার হাত পা বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কিছুতেই আর পরিত্রাণ নাই।

অরণ্যের মধ্যস্থলে কতকটা ফাঁকা। একটি স্বাভাবিক জলাশয়ের মত আছে, বর্ষাকালে তাহা জলে পরিপূর্ণ। সেই জলাশয়ের ধারে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রাজা বলিলেন "দাঁড়াও।" নক্ষত্ররায় চমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল রাজার আদেশ শুনিয়া সেই মুহূর্ত্তে কালের স্রোত যেন বন্ধ হইল—সেই মুহূর্ত্তেই যেন অরণ্যের বৃক্ষগুলি যে যেখানে ছিল ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল—নীচে হইতে ধরণী এবং উপর হইতে আকাশ যেন নিশ্বাসরুদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। কাকের কোলাহল থামিয়া গেছে, বনের মধ্যে একটা শব্দ নাই—কেবল সেই "দাঁড়াও" শব্দ অনেকক্ষণ ধরিয়া যেন গম্ গম্ করিতে লাগিল—সেই "দাঁড়াও" শব্দ যেন তড়িৎ প্রবাহের মত বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে শাখা হইতে প্রশাখায় প্রবাহিত হইতে লাগিল, অরণ্যের প্রত্যেক পাতাটা যেন সেই শব্দের কম্পনে রী রী করিতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ও যেন গাছের মতই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা তখন নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে মর্ম্মভেদী স্থির বিষণ্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন "নক্ষত্র তুমি আমাকে মারিতে চাও!"

নক্ষত্র বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন—উত্তর দিবার চেষ্টাও করিতে পারিলেন না।

রাজা কহিলেন "কেন মারিবে ভাই? রাজ্যের লোভে? তুমি কি মনে কর রাজ্য কেবল সোনার সিংহাসন, হীরার

মুকুট, ও রাজছত্র? এই মুকুট, এই রাজছত্র, এই রাজদণ্ডের ভার কত তাহা জান? শত সহস্র লোকের চিন্তা এই হীরার মুকুট দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছি। রাজ্য পাইতে চাও ত সহস্র লোকের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ কর, সহস্র লোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ কর, সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র্য বলিয়া স্কন্ধে বহন কর—এ যে করে সেই রাজা, সে পর্ণকুটীরেই থাক্ আর প্রাসাদেই থাক্। যে ব্যক্তি সকল লোককে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে, সকল লোক ত তাহারই! তাহার ঐশ্বর্য্য তাহার গৌরব তাহার সুখ, অক্ষৌহিনী সৈন্য আসিয়া কাড়িতে পারে না। পৃথিবীর দুঃখ হরণ যে করে সেই পৃথিবীর রাজা, পৃথিবীর অর্থ ও রক্ত শোষণ যে করে সে ত দস্যু—সহস্র অভাগার অশ্রুজল তাহার মস্তকে অহর্নিশি বর্ষিত হইতেছে, সেই অভিশাপধারা হইতে কোন রাজছত্র তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না! তাহার প্রচুর রাজভোগের মধ্যে শত শত উপবাসীর ক্ষুধা লুকাইয়া আছে, অনাথের দারিদ্র্য গলাইয়া সে সোনার অলঙ্কার করিয়া পরে, তাহার ভূমিবিস্তৃত রাজ-বস্ত্রের মধ্যে শত শত শীতাতুরের মলিন ছিন্নকন্থা। রাজাকে বধ করিয়া রাজত্ব মেলে না ভাই—পৃথিবীকে বশ করিয়া রাজা হইতে হয়!”

গোবিন্দমাণিক্য থামিলেন। নক্ষত্ররায় মাথা নত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

মহারাজ খাপ হইতে তরবারি খুলিলেন। নক্ষত্ররায়ের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—"ভাই, এখানে লোক নাই, সাক্ষ্য নাই, কেহ নাই—ভাইয়ের বক্ষে ভাই যদি ছুরি মারিতে চায় তবে তাহার স্থান এই, সময় এই—এখানে কেহ তোমাকে নিবারণ করিবে না, কেহ তোমাকে নিন্দা করিবে না। তোমার শিরায় আর আমার শিরায় একই রক্ত বহিতেছে, একই পিতা একই পিতামহের রক্ত—তুমি সেই রক্ত পাত কবিতে চাও, কিন্তু মনুষ্যের আবাস স্থলে করিও না। কারণ, যেখানে এই রক্তের বিন্দু পড়িবে সেইখানেই অলক্ষ্যে ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে। পাপের শেষ কোথায় গিয়া হয় কে জানে! পাপের একটি বীজ যেখানে পড়ে, সেখানে দেখিতে দেখিতে গোপনে কেমন করিয়া সহস্র বৃক্ষ জন্মায়, কেমন করিয়া অল্পে অল্পে সুশোভন মানব সমাজ অরণ্যে পরিণত হইয়া যায় তাহা কেহ জানিতে পারে না। অতএব নগরে গ্রামে, যেখানে নিশ্চিন্ত চিত্তে পরম স্নেহে ভাইয়ে ভাইয়ে গলাগলি করিয়া আছে, সেই ভাইদের নীড়ের মধ্যে ভাইয়ের রক্তপাত করিও না! এই জন্য তোমাকে আজ অরণ্যে ডাকিয়া আনিয়াছি।"

এই বলিয়া রাজা নক্ষত্ররায়ের হাতে তরবারি দিলেন।

নক্ষত্ররায়ের হাত হইতে তরবারী ভূমিতে পড়িয়া গেল। নক্ষত্ররায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন "দাদা, আমি দোষী নই—এ কথা আমার মনে কখনও উদয় হয় নাই"—

রাজা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া বলিলেন—"আমি তাহা জানি—তুমি কি কখনি আমাকে আঘাত করিতে পার!—তোমাকে পাঁচ জনে মন্দ পরামর্শ দিয়াছে।"

নক্ষত্ররায় বলিলেন—"আমাকে রঘুপতি কেবল এই উপদেশ দিতেছে!"

রাজা বলিলেন "রঘুপতির কাছ হইতে দূরে থাকিও।"

নক্ষত্ররায় বলিলেন "কোথায় যাইব বলিয়া দিন্! আমি এখানে থাকিতে চাই না! আমি এখান হইতে—রঘুপতির কাছ হইতে পালাইতে চাই।"

রাজা বলিলেন—"তুমি আমারই কাছে থাক—আর কোথাও যাইতে হইবে না—রঘুপতি তোমার কি করিবে!"

নক্ষত্ররায় রাজার হাত দৃঢ় করিয়া ধরিলেন, যেন রঘুপতি তাঁহাকে টানিয়া লইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নক্ষত্ররায় রাজার হাত ধরিয়া অরণ্যের মধ্য দিয়া যখন গৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন তখনও আকাশ হইতে অল্প অল্প আলো আসিতেছিল—কিন্তু অরণ্যের নীচে অত্যন্ত অন্ধকার।

হইয়াছে। যেন অন্ধকারের বন্যা আসিয়াছে, কেবল গাছ-গুলোর মাথা উপরে জাগিয়া আছে। ক্রমে তাহাও ডুবিয়া যাইবে—তখন অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া আকাশে পৃথিবীতে এক হইয়া যাইবে।

প্রাসাদের পথে না গিয়া রাজা মন্দিরের দিকে গেলেন। মন্দিরের সন্ধ্যা আরতি সমাপন করিয়া একটি দীপ জ্বালিয়া রঘুপতি ও জয়সিং কুটীরে বসিয়া আছেন। উভয়েই নীরবে আপনাপন ভাবনা লইয়া আছেন। দীপের ক্ষীণ আলোকে কেবল তাঁহাদের দুই জনের মুখের অন্ধকার দেখা যাইতেছে। নক্ষত্ররায় রঘুপতিকে দেখিয়া মুখ তুলিতে পারিলেন না; রাজার ছায়ায় দাঁড়াইয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিলেন—রাজা তাঁহাকে পাশে টানিয়া লইয়া দৃঢ়রূপে তাঁহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইলেন ও স্থির নেত্রে রঘুপতির মুখের দিকে একবার চাহিলেন; রঘুপতি তীব্র দৃষ্টিতে নক্ষত্ররায়ের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। অবশেষে রাজা রঘুপতিকে প্রণাম করিলেন, নক্ষত্ররায়ও তাঁহার অনুসরণ করিলেন—রঘুপতি প্রণাম গ্রহণ করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন "জয়োস্তু—রাজ্যের কুশল ?"

রাজা একটুখানি থামিয়া বলিলেন "ঠাকুর, আশীর্ব্বাদ করুন, রাজ্যের অকুশল না ঘটুক্! এ রাজ্যে মায়ের সকল সন্তান যেন সদ্ভাবে প্রেমে মিলিয়া থাকে, এ রাজ্যে ভাই-য়ের কাছ হইতে ভাইকে কেহ যেন কাড়িয়া না লয়,

যেখানে প্রেম আছে সেখানে কেহ যেন হিংসার প্রতিষ্ঠা না করে! রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়াই আসিয়াছি। পাপ সঙ্কল্পের সঙ্ঘর্ষণে দাবানল জ্বলিয়া উঠিতে পারে—নির্ব্বাণ করুন, শান্তির বারি বর্ষণ করুন, পৃথিবী শীতল করুন।”

রঘুপতি কহিলেন “দেবতার রোষানল জ্বলিয়া উঠিলে কে তাহা নির্ব্বাণ করিবে? এক অপরাধীর জন্য সহস্র নিরপরাধী সে অনলে দগ্ধ হয়!”

রাজা বলিলেন—“সেইত ভয়, সেই জন্যই ত কাঁপিতেছি! সে কথা কেহ বুঝিয়াও বোঝে না কেন? আপনি কি জানেন না এ রাজ্যে দেবতার নাম করিয়া দেবতার নিয়ম লঙ্ঘন করা হইতেছে? সেই জন্যই অমঙ্গল আশঙ্কায় আজ সন্ধ্যাবেলায় এখানে আসিয়াছি—এখানে পাপের বৃক্ষ রোপণ করিয়া আমার এই ধনধান্যময় সুখের রাজ্যে দেবতার বজ্র আহ্বান করিয়া আনিবেন না—আপনাকে এই কথা বলিয়া গেলাম, এই কথা বলিবার জন্যই আমি আজ আসিয়াছিলাম।” বলিয়া মহারাজ রঘুপতির মুখের উপর তাঁহার মর্ম্মভেদী দৃষ্টি স্থাপন করিলেন রাজার সুগম্ভীর দৃঢ়স্বর রুদ্ধ ঝটিকার মত কুটীরের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল। রঘুপতি একটী উত্তর দিলেন না, পৈতা লইয়া নাড়িতে লাগিলেন। রাজা প্রণাম করিয়া নক্ষত্ররায়ের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া আসিলেন; সঙ্গে সঙ্গে জয়সিংহও

বাহির হইলেন। ঘরের মধ্যে কেবল একটি দীপ, রঘুপতি এবং রঘুপতির বৃহৎ ছায়া রহিল।

তখন আকাশের আলো নিবিয়া গেছে। মেঘের মধ্যে তারা নিমগ্ন। আকাশের কানায় কানায় অন্ধকার। পূবে বাতাসে সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে কোথা হইতে কদম ফুলের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে এবং অরণ্যের মর্ম্মর শব্দ শুনা যাইতেছে। ভাবনায় নিমগ্ন হইয়া পরিচিত পথ দিয়া রাজা চলিতেছেন, সহসা পশ্চাৎ হইতে শুনিলেন, কে ডাকিল— "মহারাজ!"

রাজা ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি?"

পরিচিত স্বর কহিল "আমি আপনার অধম সেবক, আমি জয়সিং। মহারাজ, আপনি আমার গুরু, আমার প্রভু। আপনি ছাড়া আমার আর কেহ নাই। যেমন আপনি আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার হাত ধরিয়া অন্ধকারের মধ্যে দিয়া লইয়া যাইতেছেন তেমনি আমারও হাত ধরুন, আমাকেও সঙ্গে লইয়া যান; আমি গুরুতর অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়াছি; আমার কিসে ভাল হইবে কিসে মন্দ হইবে আমি কিছুই জানি না। আমি একবার বামে যাই-তেছি একবার দক্ষিণে যাইতেছি, আমার কর্ণধার কেহ নাই!" সেই অন্ধকারে অশ্রু পড়িতে লাগিল, কেহ দেখিতে পাইল না, কেবল আবেগ ভরে জয়সিংহের আর্দ্র স্বর কাঁপিতে কাঁপিতে রাজার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল।

স্তব্ধ স্থির অন্ধকার, বায়ুচঞ্চল সমুদ্রের মত কাঁপিতে লাগিল। রাজা জয়সিংহের হাত ধরিয়া বলিলেন "চল, আমার সঙ্গে প্রাসাদে চল!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

তাহার পর দিন যখন জয়সিং মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন, তখন পূজার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। রঘুপতি বিমর্ষ মুখে একাকী বসিয়া আছেন। ইহার পূর্ব্বে কখন এরূপ অনিয়ম হয় নাই।

জয়সিং আসিয়া গুরুর কাছে না গিয়া তাঁহার বাগানের মধ্যে গেলেন। তাঁহার গাছপালাগুলির মধ্যে গিয়া বসিলেন। তাহারা তাঁহার চারিদিকে কাঁপিতে লাগিল, নড়িতে লাগিল, ছায়া নাচাইতে লাগিল। তাঁহার চারিদিকে পুষ্পখচিত পল্লবের স্তর, শ্যামল স্তরের উপর স্তর, ছায়াপূর্ণ সুকোমল স্নেহের আচ্ছাদন, সুমধুর আহ্বান, প্রকৃতির প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন। এখানে সকলে অপেক্ষা করিয়া থাকে, কথা জিজ্ঞাসা করে না, ভাবনার ব্যাঘাত করে না, চাহিলে তবে চায়, কথা কহিলে তবে কথা কয়। এই নীরব শুশ্রূষার মধ্যে, প্রকৃতির এই অন্তঃপুরের মধ্যে বসিয়া জয়সিং ভাবিতে লাগিলেন; রাজা তাঁহাকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে ধীরে ধীরে রঘুপতি আসিয়া তাঁহার পিঠে হাত দিলেন। জয়সিং সচকিত হইয়া উঠিলেন। রঘুপতি তাঁহার পাশে বসিলেন। জয়সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া কম্পিতস্বরে কহিলেন "বৎস, তোমার এমন ভাব দেখিতেছি কেন? আমি তোমার কি করিয়াছি যে তুমি অল্পে অল্পে আমার কাছ হইতে সরিয়া যাইতেছ?"

জয়সিং কি বলিতে চেষ্টা করিলেন, রঘুপতি তাহাতে বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন—"এক মুহূর্ত্তের জন্য কি আমার স্নেহের অভাব দেখিয়াছ? আমি কি তোমার কাছে কোন অপরাধ করিয়াছি জয়সিং? যদি করিয়া থাকি—তবে আমি তোমার গুরু, তোমার পিতৃ-তুল্য, আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি আমাকে মার্জ্জনা কর!"

জয়সিং সহসা বজ্রবিদ্ধের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন—গুরুর চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—বলিলেন "পিতা, আমি কিছুই জানিনা, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না—আমি কোথায় যাইতেছি দেখিতে পাইতেছি না!"

রঘুপতি জয়সিংহের হাত ধরিয়া বলিলেন—"বৎস, আমি তোমাকে তোমার শৈশব হইতে মাতার ন্যায় স্নেহে পালন করিয়াছি, পিতার ন্যায় যত্নে শাস্ত্রশিক্ষা দিয়াছি—তোমার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সখার ন্যায় তোমাকে আমার সমুদায় মন্ত্রণার সহযোগী করিয়াছি। আজ তোমাকে কে আমার পাশ হইতে টানিয়া লইতেছে,

এতদিনকার স্নেহ মমতার বন্ধন কে বিচ্ছিন্ন করিতেছে? তোমার উপর যে আমার দেবদত্ত অধিকার জন্মিয়াছে সেই পবিত্র অধিকারে কে হস্তক্ষেপ করিয়াছে? বল, বৎস, সেই মহাপাতকীর নাম বল।"

জয়সিং বলিলেন—"প্রভু, আপনার কাছ হইতে আমাকে কেহ বিচ্ছিন্ন করে নাই—আপনিই আমাকে দূর করিয়া দিয়াছেন। আমি ছিলাম গৃহের মধ্যে, আপনি সহসা পথের মধ্যে আমাকে বাহির করিয়া দিয়াছেন। আপনি বলিয়াছেন কেই বা পিতা, কেই বা মাতা, কেই বা ভ্রাতা! আপনি বলিযাছেন পৃথিবীতে কোন বন্ধন নাই, স্নেহ প্রেমের পবিত্র অধিকার নাই। যাঁহাকে মা বলিয়া জানিতাম আপনি তাঁহাকে বলিয়াছেন শক্তি। যে যেখানে হিংসা করিতেছে, যে যেখানে রক্তপাত করিতেছে, যেখানেই ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ, যেখানেই দুই জন মানুষে যুদ্ধ, সেইখানেই এই তৃষিত শক্তি রক্তলালসায় তাঁহার খর্পর লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন! আপনি মায়ের কোল হইতে আমাকে এ কি রাক্ষসীর দেশে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছেন!"

রঘুপতি অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "তবে তুমি স্বাধীন হইলে, বন্ধন-মুক্ত হইলে, তোমার উপর হইতে আমার সমস্ত অধিকার আমি প্রত্যাহরণ করিলাম, তাহাতেই যদি

তুমি সুখী হও, তবে তাই হউক!” বলিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিলেন।

জয়সিং তাঁহার পা ধরিয়া বলিলেন “না না না প্রভু— আপনি আমাকে ত্যাগ করিলেও আমি আপনাকে ত্যাগ করিতে পারি না। আমি রহিলাম আপনার পদতলেই রহিলাম, আপনি যাহা ইচ্ছা করিবেন। আপনার পথছাড়া আমার অন্য পথ নাই!”

রঘুপতি তখন জয়সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন— তাঁহার অশ্রু প্রবাহিত হইয়া জয়সিংহের স্কন্ধে পড়িতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মন্দিরে অনেক লোক জমা হইয়াছে। খুব কোলাহল উঠিয়াছে। রঘুপতি রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমরা কি করিতে আসিয়াছ!”

তাহারা নানা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল “আমরা ঠাকরুণ দর্শন করিতে আসিয়াছি!”

রঘুপতি বলিয়া উঠিলেন “ঠাকরুণ কোথায়! ঠাকরুণ এ রাজ্য থেকে চলে গেছেন। তোরা ঠাকরুণকে রাখ্‌তে পার্‌লি কৈ? তিনি চলে গেছেন।”

ভারি গোলমাল উঠিল—নানাদিক হইতে নানা কথা শুনা যাইতে লাগিল—“সে কি কথা ঠাকুর!”

"আমরা কি অপরাধ করেছি ঠাকুর!"

"মা কি কিছুতেই প্রসন্ন হবেন না!"

"আমার ভাইপোর ব্যাম ছিল বলে আমি ক দিন পূজা দিতে আসিনি।" (তার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহারই উপেক্ষা সহিতে না পারিয়া দেবী দেশ ছাড়িতেছেন।)

"আমার পাঁঠা দুটি ঠাকরুণকে দেব মনে করেছিলুম, বিস্তর দূর ব'লে আস্‌তে পারিনি!" দুটো পাঁঠা দিতে দেরী করিয়া রাজ্যের যে এরূপ অমঙ্গল ঘটিল, ইহাই মনে করিয়া সে কাতর হইতেছিল।)

"গোবর্দ্ধন যা মানত করেছিল তা' মাকে দেয়নি বটে কিন্তু মাও ত তেম্‌নি তা'কে শাস্তি দিয়েছেন। তার পিলে বেড়ে ঢাক হয়েছে, সে আজ ছমাস বিছানায় প'ড়ে!" (গোবর্দ্ধন তাহার প্লীহার আতিশয্য লইয়া চুলায় যাক্, মা দেশে থাকুন্ এইরূপ সে মনে মনে প্রার্থনা করিল। সকলেই অভাগা গোবর্দ্ধনের প্লীহার প্রচুর উন্নতি কামনা করিতে লাগিল।)

ভিড়ের মধ্যে একটি দীর্ঘপ্রস্থ লোক ছিল সে সকলকে ধমক দিয়া থামাইল, এবং রঘুপতিকে যোড়হস্তে কহিল "ঠাকুর, মা কেন চলিয়া গেলেন, আমাদের কি অপরাধ হইয়াছিল!"

রঘুপতি কহিলেন "তোরা মায়ের জন্য একফোঁটা রক্ত দিতে পারিস্‌নে, এই ত তোদের ভক্তি!"

সকলে চুপ করিয়া রহিল। অবশেষে কথা উঠিতে লাগিল। অস্পষ্ট স্বরে কেহ কেহ বলিতে লাগিল—"রাজার নিষেধ, আমরা কি করিব!"

জয়সিং প্রস্তরের পুত্তলিকার মত স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। "মায়ের নিষেধ" এই কথা তড়িদ্বেগে তাঁহার রসনাগ্রে উঠিয়াছিল—কিন্তু তিনি আপনাকে দমন করিলেন, একটি কথা কহিলেন না।

রঘুপতি তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"রাজা কে। মায়ের সিংহাসন কি রাজার সিংহাসনের নীচে! তবে এই মাতৃহীন দেশে তোদের রাজাকে লইয়াই তোরা থাক্! তোদের কে রক্ষা করে দেখিব!"

জনতার মধ্যে গুন্ গুন্ শব্দ উঠিল। সকলেই সাবধানে কথা কহিতে লাগিল।

রঘুপতি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "রাজাকেই বড় করিয়া লইয়া তোদের মাকে তোরা রাজ্য হইতে অপমান করিয়া বিদায় করিলি! সুখে থাকিবি মনে করিস্‌নে! আজ তিন বৎসর পরে এতবড় রাজ্যে তোদের ভিটের চিহ্ন থাকিবে না—তোদের বংশে বাতী দিবার কেহ থাকিবে না!"

জনতার মধ্যে সাগরের গুন্ গুন্ শব্দ ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল। জনতাও ক্রমে বাড়িতেছে। সেই দীর্ঘলোকটি যোড়হাত করিয়া রঘুপতিকে কহিল—"সন্তান

যদি অপরাধ করে থাকে তবে মা তাকে শাস্তি দিন—কিন্তু মা সন্তানকে একেবারে পরিত্যাগ করে যাবেন এ কি কখন হয়! প্রভু ব'লে দি'ন কি কর্‌লে মা ফিরে আস্‌বেন।”

রঘুপতি কহিলেন “তোদের এই রাজা যখন এ রাজ্য হইতে বাহির হইয়া যাইবেন মাও তখন এই রাজ্যে পুনর্ব্বার পদার্পণ করবেন।”

এই কথা শুনিয়া জনতার গুন্ গুন্ শব্দ হঠাৎ থামিয়া গেল। হঠাৎ চতুর্দ্দিক্ সুগভীর নিস্তব্ধ হইয়া গেল, অবশেষে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল; কেহ সাহস করিয়া কথা কহিতে পারিল না।

রঘুপতি মেঘগম্ভীরস্বরে কহিলেন “তবে তোরা দেখিবি! আয়, আমার সঙ্গে আয়! অনেক দূর হ'তে অনেক আশা করিয়া তোরা ঠাকুরুণকে দর্শন করিতে আসিয়াছিস্—চল্ একবার মন্দিরে চল্!”

সকলে সভয়ে মন্দিরের সম্মুখে প্রাঙ্গনে আসিয়া সমবেত হইল। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ ছিল—রঘুপতি ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া দিলেন।

কিয়ৎক্ষণ কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। প্রতিমার মুখ দেখা যাইতেছে না, প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ দর্শকের দিকে স্থাপিত!—মা বিমুখ হইয়াছেন! সহসা জনতার মধ্য হইতে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল “একবার ফিরিয়া দাঁড়াও

মা! আমরা কি অপরাধ করিয়াছি!” চারিদিকে “মা কোথায়, মা কোথায়’ রব উঠিল। প্রতিমা পাষাণ বলিয়াই ফিরিল না। অনেকে মূর্চ্ছা গেল। ছেলেরা কিছু না বুঝিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বৃদ্ধেরা মাতৃহারা শিশুসন্তানের মত ডাকিতে লাগিল “মা—ওমা!” স্ত্রীলোকদের ঘোমটা খুলিয়া গেল, অঞ্চল খসিয়া পড়িল—তাহারা বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল। যুবকেরা কম্পিত উর্দ্ধস্বরে বলিতে লাগিল “মা তোকে আমরা ফিরিয়ে আন্‌ব—তোকে আমরা ছাড়্‌ব না!” এক জন পাগল গাহিয়া উঠিল—

“মা আমার পাষাণের মেয়ে,
সন্তানে দেখ্‌লিনে চেয়ে!”

মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সমস্ত রাজ্য যেন মা মা করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল—কিন্তু প্রতিমা ফিরিল না। মধ্যাহ্নের সূর্য্য প্রখর হইয়া উঠিল—প্রাঙ্গনে উপবাসী জনতার বিলাপ থামিল না।

তখন জয়সিং কম্পিত পদে আসিয়া রঘুপতিকে কহিলেন—“প্রভু, আমি কি একটি কথাও কহিতে পাইব না!”

রঘুপতি অঙ্গুলি তুলিয়া কহিলেন—“না, একটি কথাও না।”

জয়সিংহ কহিলেন “সন্দেহের কি কোন কারণ নাই!”

রঘুপতি দৃঢ়স্বরে কহিলেন “না!”

জয়সিং দৃঢ়রূপে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কহিলেন "সমস্তই কি বিশ্বাস করিব!"

রঘুপতি জয়সিংহকে সুতীব্র দৃষ্টিদ্বারা দগ্ধ করিয়া কহিলেন "হাঁ!"

জয়সিংহ বক্ষে হাত দিয়া কহিলেন—"আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে!" তিনি জনতার মধ্য হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

তাহার পরদিন ২৯ শে আষাঢ়। আজ রাত্রে চতুর্দ্দশ দেবতার পূজা। আজ প্রভাতে তালবনের আড়ালে সূর্য্য যখন উঠিতেছেন, তখন পূর্ব্বদিকে মেঘ নাই। কনককিরণপ্লাবিত আনন্দমগ্ন কাননের মধ্যে গিয়া জয়সিং যখন বসিলেন তখন তাঁহার পুরাতন স্মৃতি সকল মনে উঠিতে লাগিল। এই বনের মধ্যে এই পাষাণ মন্দিরের পাষাণ সোপানাবলীর মধ্যে, এই গোমতী তীরে সেই বৃহৎ বটের ছায়ায়, সেই ছায়া দিয়া ঘেরা পুকুরের ধারে তাঁহার বাল্যকাল সুমধুর স্বপ্নের মত মনে পড়িতে লাগিল। যে সকল মধুর দৃশ্য তাঁহার বাল্যকালকে সস্নেহে ঘিরিয়া থাকিত, তাহারা আজ হাসিতেছে, তাঁহাকে আবার আহ্বান করিতেছে, কিন্তু তাঁহার মন বলিতেছে "আমি যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি, আমি বিদায় লইয়াছি, আমি

আর ফিরিব না!” শ্বেত পাষাণের মন্দিরের উপরে সূর্য্য-কিরণ পড়িয়াছে এবং তাহার বামদিকের ভিত্তিতে কম্পিত বকুলশাখার কম্পিত ছায়া পড়িয়াছে। ছেলেবেলায় এই পাষাণমন্দিরকে যেমন সচেতন বোধ হইত—এই সোপানের মধ্যে একলা বসিয়া যখন খেলা করিতেন তখন এই সোপানগুলির মধ্যে যেমন সঙ্গ পাইতেন, আজ প্রভাতের সূর্য্যকিরণে মন্দিরকে তেম্‌নি সচেতন, তাহার সোপানগুলিকে তেম্‌নি শৈশবের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। মন্দিরের ভিতরে মাকে আজ আবার মা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু অভিমানে তাঁহার হৃদয় পূরিয়া গেল, তাঁহার দুইচক্ষু ভাসিয়া জল পড়িতে লাগিল।

রঘুপতিকে আসিতে দেখিয়া জয়সিং চোখের জল মুছিয়া ফেলিলেন। গুরুকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। রঘুপতি কহিলেন—“আজ পূজার দিন। মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া কি শপথ করিয়াছিলে মনে আছে!”

জয়সিংহ কহিলেন—“আছে।”

রঘুপতি—“শপথ পালন করিবে ত!”

জয়সিং—“হাঁ।”

রঘুপতি “দেখিও বৎস, সাবধানে কাজ করিও। বিপদের আশঙ্কা আছে। আমি তোমাকে রক্ষা করিবার জন্যই প্রজাদিগকে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছি।”

জয়সিং চুপ করিয়া রঘুপতির মুখের দিকে চাহিয়া রহি-

লেন কিছুই উত্তর করিলেন না। রঘুপতি তাঁহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন "আমার আশীর্ব্বাদে নির্ব্বিঘ্নে তুমি তোমার কার্য্য-সাধন করিতে পারিবে, মায়ের আদেশ পালন করিতে পারিবে!" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

অপরাহ্ণে একটি ঘরে বসিয়া রাজা ধ্রুবের সহিত খেলা করিতেছেন। ধ্রুবের আদেশ-মতে একবার মাথায় মুকুট দিতেছেন, একবার মাথা হইতে মুকুট খুলিতেছেন—ধ্রুব মহারাজের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইতেছে। রাজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "আমি অভ্যাস করিতেছি। তাঁহার আদেশে এ মুকুট যেমন সহজে পরিতে পারিয়াছি, তাঁহার আদেশে এ মুকুট যেন তেম্নি সহজে খুলিতে পারি। মুকুট পরা শক্ত কিন্তু মুকুট ত্যাগ করা আরও কঠিন।"

ধ্রুবের মনে সহসা একটা ভাবোদয় হইল—কিয়ৎক্ষণ রাজার মুখের দিকে চাহিয়া মুখে আঙ্গুল দিয়া বলিল—"তুমি আজা!" "রাজা" শব্দ হইতে "র" অক্ষর একেবারে সমূলে লোপ করিয়া দিয়াও ধ্রুবের মনে কিছুমাত্র অনুতাপের উদয় হইল না। রাজার মুখের সাম্‌নে রাজাকে আজা বলিয়া সে সম্পূর্ণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিল।

রাজা ধ্রুবের এই ধৃষ্টতা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন "তুমি আজা।"

ধ্রুব বলিল—"তুমি আজা!"

এ বিষয়ে তর্কের শেষ হইল না। কোন পক্ষে কোন প্রমাণ নাই, তর্ক কেবলই গায়ের জোরে! অবশেষে রাজা নিজের মুকুট লইয়া ধ্রুবের মাথায় চড়াইয়া দিলেন। তখন ধ্রুবের আর কথাটি কহিবার যো রহিল না, তাহার সম্পূর্ণ হার হইল। ধ্রুবের মুখের আধখানা সেই মুকুটের নীচে ডুবিয়া গেল। মুকুট সমেত মস্ত মাথা ঢুলাইয়া ধ্রুব মুকুটহীন রাজার প্রতি আদেশ করিল—"একটা গল্প বল।"

রাজা বলিলেন "কি গল্প বলিব ?"

ধ্রুব কহিল "দিদির গল্প বল।" গল্প মাত্রকেই ধ্রুব দিদির গল্প বলিয়া জানিত। সে জানিত দিদি তাহাকে যে সকল গল্প করিত তাহা ছাড়া পৃথিবীতে আর গল্প নাই।

রাজা তখন মস্ত এক পৌরাণিক গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন "হিরণ্য কশিপু নামে এক আজা ছিল।"

আজা শুনিয়া ধ্রুব বলিয়া উঠিল "আমি আজা!" মস্ত ঢিলে মুকুটের জোরে হিরণ্যকশিপুর রাজপদ সে একেবারে অগ্রাহ্য করিল।

চাটুভাষী সভাসদের ন্যায় গোবিন্দমাণিক্য সেই কিরীটি শিশুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিলেন "তুমিও আজা সেও আজা।"

ধ্রুব তাহাতেও সুস্পষ্ট অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল "না, আমি আজা!"

অবশেষে মহারাজ যখন বলিলেন "হিরণ্য কশিপু আজা নয় সে আক্কস্ (রাক্ষস,)" তখন ধ্রুব তাহাতে আপত্তি করিবার কিছুই দেখিল না।

এমন সময়ে নক্ষত্ররায় গৃহে প্রবেশ করিলেন—কহিলেন "শুনিলাম, রাজকার্য্যোপলক্ষে মহারাজ আমাকে ডাকিয়াছেন। আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি।"

রাজা কহিলেন "আরেক্‌টু অপেক্ষা কর, গল্পটা শেষ করিয়া লই।" বলিয়া গল্পটা সমস্ত শেষ করিলেন। "আক্কস দুষ্টু।" গল্প শুনিয়া সংক্ষেপে ধ্রুব এইরূপ মত প্রকাশ করিল।

ধ্রুবের মাথায় মুকুট দেখিয়া নক্ষত্ররায়ের ভাল লাগে নাই। ধ্রুব যখন দেখিল নক্ষত্ররায়ের দৃষ্টি তাহার দিকে স্থাপিত রহিয়াছে, তখন সে নক্ষত্ররায়কে গম্ভীরভাবে জানাইয়া দিল "আমি আজা।"

নক্ষত্র বলিলেন "ছি, ও কথা বলিতে নাই" বলিয়া ধ্রুবের মাথা হইতে মুকুট তুলিয়া লইয়া রাজার হাতে দিতে উদ্যত হইলেন। ধ্রুব মুকুট হরণের সম্ভাবনা দেখিয়া সত্যকার রাজাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিল। গোবিন্দমাণিক্য তাহাকে এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন, নক্ষত্রকে নিবারণ করিলেন।

অবশেষে গোবিন্দমাণিক্য নক্ষত্ররায়কে কহিলেন—"শুনিয়াছি, রঘুপতি ঠাকুর অসৎ উপায়ে প্রজাদের অসন্তোষ উদ্রেক করিয়া দিতেছেন। তুমি স্বয়ং নগরের মধ্যে গিয়া এ বিষয়ে তদারক করিয়া আসিবে এবং সত্য মিথ্যা অবধারণ করিয়া আমাকে জানাইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "যে আজ্ঞে!" বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু ধ্রুবের মাথায় মুকুট তাঁহার কিছুতেই ভাল লাগিল না।

প্রহরী আসিয়া কহিল "পুরোহিত ঠাকুরের সেবক জয়সিং সাক্ষাৎ প্রার্থনায় দ্বারে দাঁড়াইয়া।"

রাজা তাহাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

জয়সিং মহারাজকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে কহিলেন "মহারাজ, আমি বহু দূরদেশে চলিয়া যাইতেছি। আপনি আমার রাজা, আমার পিতা, আমার গুরু, আপনার আশীর্ব্বাদ লইতে আসিয়াছি।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় যাইবে জয়সিং?"

জয়সিং কহিলেন "জানি না মহারাজ, কোথায় তাহা কেহ বলিতে পারে না!" রাজাকে কথা কহিতে উদ্যত দেখিয়া জয়সিং কহিলেন "নিষেধ করিবেন না মহারাজ! আপনি নিষেধ করিলে আমার যাত্রা শুভ হইবে না। আশীর্ব্বাদ করুন এখানে আমার যে সকল সংশয় ছিল সেখানে যেন সে সকল সংশয় দূর হইয়া যায়। এখানকার

মেঘ সেখানে যেন কাটিয়া যায়! যেন আপনার মত রাজার রাজত্বে যাই, যেন শান্তি পাই!"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "কবে যাইবে?"

জয়সিং কহিলেন "আজ সন্ধ্যাকালে। অধিক সময় নাই মহারাজ, আজ আমি তবে বিদায় হই।" বলিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া রাজার পদধূলি লইলেন, রাজার চরণে দুই-ফোঁটা অশ্রুজল পড়িল।

জয়সিং উঠিয়া যখন যাইতে উদ্যত হইলেন তখন ধ্রুব ধীরে ধীরে গিয়া তাঁহার কাপড় টানিয়া কহিল "তুমি যেওনা!"

জয়সিং হাসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া কহিলেন "কার কাছে থাকিব বৎস? আমার কে আছে?"

ধ্রুব কহিল "আমি আজা!"

জয়সিং কহিলেন "তোমরা রাজার রাজা, তোমরাই সকলকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছ!" ধ্রুবকে কোল হইতে নামাইয়া জয়সিংহ গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মহারাজ গম্ভীর মুখে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্দ্দশী তিথি। মেঘও করিয়াছে চাঁদও উঠিয়াছে। আকাশের কোথাও আলো কোথাও অন্ধকার। কখনও

চাঁদ বাহির হইতেছে, কখনও চাঁদ লুকাইতেছে। গোমতী তীরের অরণ্যগুলি চাঁদের দিকে চাহিয়া তাহাদের গভীর অন্ধকার রাশির মর্ম্মভেদ করিয়া মাঝে মাঝে নিশ্বাস ফেলিতেছে।

আজ রাত্রে পথে লোক বাহির হওয়া নিষেধ। রাত্রে পথে লোক কেই বা বাহির হয়! কিন্তু নিষেধ আছে বলিয়া পথের বিজনতা আজ আরও গভীরতর বোধ হইতেছে। নগরবাসীরা সকলেই আপনার ঘরের দীপ নিভাইয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। পথে একটি প্রহরী নাই। চোরও আজ পথে বাহির হয় না। যাহারা শ্মশানে শবদাহ করিতে যাইবে তাহারা মৃতদেহ ঘরে লইয়া প্রভাতের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। ঘরে যাহাদের সন্তান মুমূর্ষু তাহারা বৈদ্য ডাকিতে বাহির হয় না। যে ভিক্ষুক পথপ্রান্তে বৃক্ষতলে শয়ন করিত সে আজ গৃহস্থের গোশালায় আশ্রয় লইয়াছে।

সে রাত্রে শৃগাল কুকুর নগরের পথে বিচরণ করিতেছে, দুই একটা চিতাবাঘ গৃহস্থের দ্বারের কাছে আসিয়া উঁকি মারিতেছে। মানুষের মধ্যে কেবল একজন মাত্র আজ গৃহের বাহিরে আছে—আর মানুষ নাই। সে একখানা ছুরি লইয়া নদীতীরে পাথরের উপর শান দিতেছে, এবং অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছে। ছুরিতে ধার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সে বোধকরি ছুরির সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাতেও

শান দিতেছিল, তাই তার শান দেওয়া আর শেষ হইতে-ছিল না। প্রস্তরের ঘর্ষণে তীক্ষ্ণ ছুরি হিস্ হিস্ শব্দ করিয়া হিংসার লালসায় তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার নদী বহিয়া যাইতেছিল। জগতের উপর দিয়া অন্ধকার রজনীর প্রহর বহিয়া যাইতেছিল। মাথায় আকা-শের উপর দিয়া অন্ধকার ঘন মেঘের স্রোত ভাসিয়া যাই-তেছিল।

অবশেষে যখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল, তখন জয়সিংহের চেতনা হইল। তপ্ত ছুরি খাপের মধ্যে পূরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পূজার সময় নিকটবর্ত্তী হই-য়াছে। তাঁহার শপথের কথা মনে পড়িয়াছে। আর এক-দণ্ডও বিলম্ব করিলে চলিবে না।

মন্দির আজ সহস্র দীপে আলোকিত। ত্রয়োদশ দেব-তার মাঝখানে কালী দাঁড়াইয়া নররক্তের জন্য জিহ্বা মেলিয়াছেন। মন্দিরের সেবকদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া, চতুর্দ্দশ দেবপ্রতিমা সম্মুখে করিয়া রঘুপতি একাকী মন্দিরে বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে এক দীর্ঘ খাঁড়া। উলঙ্গ উজ্জ্বল খড়্গ দীপালোকে বিভাসিত হইয়া স্থির বজ্রের ন্যায় দেবীর আদেশের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

অর্দ্ধরাত্রে পূজা। সময় নিকটবর্ত্তী। রঘুপতি অত্যন্ত অস্থির চিত্তে জয়সিংহের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। সহসা ঝড়ের মত বাতাস উঠিয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে

আরম্ভ হইল। বাতাসে মন্দিরের সহস্র দীপশিখা কাঁপিতে লাগিল, উলঙ্গ খড়্গের উপর বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। চতুর্দ্দশ দেবতা এবং রঘুপতির ছায়া যেন জীবন পাইয়া দীপশিখার নৃত্যের তালে তালে মন্দিরের ভিত্তিময় নাচিতে লাগিল। একটা নর-কপাল ঝড়ের বাতাসে ঘরময় গড়াইতে লাগিল। মন্দিরের মধ্যে দুইটা চামচিকা আসিয়া শুষ্কপত্রের মত ক্রমাগত উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল—দেয়ালে তাহাদের ছায়া উড়িতে লাগিল।

দ্বিপ্রহর হইল। প্রথমে নিকটে পরে দূর দূরান্তরে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। ঝড়ের বাতাসও তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পূজার সময় হইয়াছে। রঘুপতি অমঙ্গল আশঙ্কায় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন।

এমন সময়ে জীবন্ত ঝড়বৃষ্টিবিদ্যুতের মত জয়সিং নিশীথের অন্ধকারের মধ্যে হইতে সহসা মন্দিরের আলোকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দীর্ঘ চাদরে দেহ আচ্ছাদিত, সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া বৃষ্টিধারা পড়িতেছে, নিশ্বাস বেগে বহিতেছে, চক্ষুতারকায় অগ্নিকণা জ্বলিতেছে।

রঘুপতি তাঁহাকে ধরিয়া কানের কাছে মুখ দিয়া কহিলেন "রাজরক্ত আনিয়াছ!"

জয়সিং তাঁহার হাত ছাড়াইয়া উচ্চস্বরে কহিলেন। "আনিয়াছি! রাজরক্ত আনিয়াছি! আপনি সরিয়া দাঁড়ান,

আমি দেবীকে নিবেদন করি।" শব্দে মন্দির কাঁপিয়া উঠিল।

কালীর প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন— "সত্যই কি তবে তুই সন্তানের রক্ত চাস্ মা! রাজরক্ত নহিলে তোর তৃষা মিটিবে না! জন্মাবধি আমি তোকেই মা বলিয়া আসিয়াছি, আমি তোরই সেবা করিয়াছি, আমি আর কাহারও দিকে চাই নাই, আমার জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমি রাজপুত, আমি ক্ষত্রিয়, আমার প্রপিতামহ রাজা ছিলেন, আমার মাতামহ-বংশীয়েরা আজও রাজত্ব করিতেছেন। এইনে তবে তোর সন্তানের রক্ত, তোর রাজরক্ত এই নে!" গাত্র হইতে চাদর পড়িয়া গেল। কটিবন্ধ হইতে ছুরি বাহির করিলেন—বিদ্যুৎ নাচিয়া উঠিল—চকিতের মধ্যে সেই ছুরি আমূল তাঁহার হৃদয়ে নিহিত করিলেন, মরণের তীক্ষ্ণ জিহ্বা তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। প্রতিমার পদতলে পড়িয়া গেলেন; পাষাণ-প্রতিমা বিচলিত হইল না।

রঘুপতি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—জয়সিংকে তুলিবার চেষ্টা করিলেন, তুলিতে পারিলেন না। তাঁহার মৃতদেহের উপর পড়িয়া রহিলেন। রক্ত গড়াইয়া মন্দিরের শ্বেত প্রস্তরের উপর প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে দীপগুলি একে একে নিবিয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত রাত্রি একটি প্রাণীর নিশ্বাসের শব্দ শুনা গেল। রাত্রি

তৃতীয় প্রহরের সময় ঝড় থামিয়া চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া গেল। রাত্রি চতুর্থ প্রহরের সময় মেঘের ছিদ্র দিয়া চন্দ্রালোক মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। চন্দ্রালোক জয়-সিংহের পাণ্ডুবর্ণ মুখের উপর পড়িল। চতুর্দ্দশ দেবতা শিয়রে দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। প্রভাতে বন হইতে যখন পাখী ডাকিয়া উঠিল তখন রঘুপতি মৃতদেহ ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

রাজার আদেশমত প্রজাদের অসন্তোষের কারণ অনু-সন্ধানের জন্য নক্ষত্ররায় স্বয়ং প্রাতঃকালে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার ভাবনা হইতে লাগিল, মন্দিরে কি করিয়া যাই! রঘুপতির সম্মুখে পড়িলে তিনি কেমন অস্থির হইয়া পড়েন, আত্মসম্বরণ করিতে পারেন না। রঘুপতির সম্মুখে পড়িতে তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। এই জন্য তিনি স্থির করিয়াছেন, রঘুপতির দৃষ্টি এড়াইয়া গোপনে জয়সিংহের কক্ষে গিয়া তাঁহার নিকট হইতে সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

নক্ষত্ররায় ধীরে ধীরে জয়সিংহের কক্ষে প্রবেশ করি-লেন। প্রবেশ করিয়াই মনে করিলেন, ফিরিতে পারিলে বাঁচি। দেখিলেন, জয়সিংহের পুঁথি, তাঁহার বসন, তাঁহার গৃহসজ্জা চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে, মাঝখানে রঘুপতি

খসিয়া। জয়সিংহ নাই। রঘুপতির লোহিত চক্ষু অঙ্গারের ন্যায় জ্বলিতেছে, তাঁহার কেশপাশ বিশৃঙ্খল। তিনি নক্ষত্র-রায়কে দেখিয়াই দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁহার হাত ধরিলেন। বল-পূর্ব্বক তাঁহাকে মাটিতে বসাইলেন। নক্ষত্ররায়ের প্রাণ উড়িয়া গেল। রঘুপতি তাঁহার অঙ্গার নয়নে নক্ষত্র-রায়ের মর্ম্মস্থান পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া পাগলের মত বলিলেন "রক্ত কোথায়!" নক্ষত্র রায়ের হৃৎপিণ্ডে রক্তের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, মুখ দিয়া কথা সরিল না।

রঘুপতি উচ্চস্বরে বলিলেন "তোমার প্রতিজ্ঞা কোথায়! রক্ত কোথায়!"

নক্ষত্ররায় হাত নাড়িলেন, পা নাড়িলেন, বামে সরিয়া বসিলেন, কাপড়ের প্রান্ত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, তাঁহার ঘর্ম্ম বহিতে লাগিল, তিনি শুষ্কমুখে বলিলেন— "ঠাকুর—"

রঘুপতি কহিলেন—"এবার মা যে স্বয়ং খড়্গ তুলিয়া-ছেন—এবার চারিদিকে যে রক্তের স্রোত বহিতে থাকিবে—এবার তোমাদের বংশে এক ফোঁটা রক্ত যে বাকী থাকিবে না। তখন দেখিব নক্ষত্ররায়ের ভ্রাতৃস্নেহ!"

"ভ্রাতৃস্নেহ! হাঃ হাঃ হাঃ!—ঠাকুর"—নক্ষত্র রায়ের হাসি আর বাহির হইল না—গলা শুকাইয়া গেল।

রঘুপতি কহিলেন—"আমি গোবিন্দ মাণিক্যের রক্ত চাই না। পৃথিবীতে গোবিন্দমাণিক্যের যে প্রাণের অপেক্ষা

প্রিয় আমি তাহাকেই চাই! তাহার রক্ত লইয়া আমি গোবিন্দমাণিক্যের গায়ে মাখাইতে চাই—তাহার বক্ষস্থল রক্তবর্ণ হইয়া যাইবে—সে রক্তের চিহ্ন কিছুতেই মুছিবে না! এই দেখ—চাহিয়া দেখ!" বলিয়া উত্তরীয় মোচন করিলেন, তাঁহার দেহ রক্তে লিপ্ত, তাঁহার বক্ষদেশে স্থানে স্থানে রক্ত জমিয়া আছে।

নক্ষত্ররায় শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাত পা কাঁপিতে লাগিল।

রঘুপতি বজ্রমুষ্টিতে নক্ষত্র রায়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"সে কে? কে গোবিন্দমাণিক্যের প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়? কে চলিয়া গেলে গোবিন্দমাণিক্যের চক্ষে পৃথিবী শ্মশান হইয়া যাইবে, তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য চলিয়া যাইবে? সকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই কাহার মুখ তাঁহার মনে পড়ে, কাহার স্মৃতি সঙ্গে করিয়া তিনি রাত্রে শয়ন করিতে যান, তাঁহার হৃদয়ের নীড় সমস্তটা পরিপূর্ণ করিয়া কে বিরাজ করিতেছে! সে কে? সে কি তুমি?" বলিয়া, ব্যাঘ্র লম্ফ দিবার পূর্ব্বে কম্পিত হরিণ-শিশুর দিকে যেমন এক দৃষ্টিতে চায়, রঘুপতি তেমনি নক্ষত্রের দিকে চাহিলেন।

নক্ষত্ররায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"না, আমি না!" কিন্তু কিছুতেই রঘুপতির মুষ্টি ছাড়াইতে পারিলেন না।

রঘুপতি বলিলেন —"তবে, বল সে কে ?"

নক্ষত্ররায় বলিয়া ফেলিলেন—"সে ধ্রুব।"

রঘুপতি বলিলেন—"ধ্রুব কে ?"

নক্ষত্ররায়—"সে একটি শিশু—"

রঘুপতি বলিলেন—"আমি জানি, তাহাকে জানি! রাজার নিজের সন্তান নাই, তাহাকেই সন্তানের মত পালন করিতেছেন। নিজের সন্তানকে লোকে কেমন ভালবাসে জানিনা, কিন্তু পালিত সন্তানকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে তাহা জানি। আপনার সমুদয় সম্পদের চেয়ে তাহার সুখ রাজার বেশী মনে হয়। আপনার মাথায় মুকুটের চেয়ে তাহার মাথায় মুকুট দেখিলে রাজার বেশী আনন্দ হয়।"

নক্ষত্র রায় আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"ঠিক কথা।"

রঘুপতি কহিলেন—"ঠিক কথা নয় ত কি? রাজা তাহাকে কতখানি ভালবাসেন তাহা কি আমি জানি না? আমি কি বুঝিতে পারি না? আমিও তাহাকেই চাই।"

নক্ষত্ররায় হাঁ করিয়া রঘুপতির দিকে চাহিয়া রহিলেন। আপন মনে বলিলেন "তাহাকেই চাই।"

রঘুপতি কহিলেন—"তাহাকে আনিতেই হইবে—আজই আনিতে হইবে—আজ রাত্রেই চাই।" নক্ষত্ররায় প্রতি-ধ্বনির মত কহিলেন "আজরাত্রেই চাই।"

নক্ষত্র রায়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া গলার স্বর নামাইয়া রঘুপতি বলিলেন—"এই শিশুই তোমার শত্রু, তাহা জান? তুমি রাজবংশে জন্মিয়াছ—কোথাকার এক অজ্ঞাতকুলশীল শিশু তোমার মাথা হইতে মুকুট কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে তাহা কি জান? যে সিংহাসন তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, সেই সিংহাসনে তাহার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা কি দুটো চক্ষু থাকিতে দেখিতে পাইতেছ না?"

নক্ষত্র রায়ের কাছে এ সকল কথা নূতন নহে। তিনিও পূর্ব্বে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। সগর্ব্বে বলিলেন "তা' কি আর বলিতে হইবে ঠাকুর? আমি কি আর এইটে দেখিতে পাই না!"

রঘুপতি কহিলেন—"তবে আর কি! তবে তাহাকে আনিয়া দেও। তোমার সিংহাসনের বাধা দূর করি! এই ক'টা প্রহর কোন মতে কাটিবে, তারপরে—তুমি কখন আনিবে?"

নক্ষত্র রায়—"আজ সন্ধ্যাবেলায়—অন্ধকার হইলে।"

পৈতা স্পর্শ করিয়া রঘুপতি বলিলেন—"যদি না আনিতে পার ত ব্রাহ্মণের অভিশাপ লাগিবে। তা হইলে, যে মুখে তুমি প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিয়া পালন না কর, ত্রিরাত্রি না পোহাইতে সেই মুখের মাংস শকুনি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইবে!"

শুনিয়া নক্ষত্ররায় চমকিয়া মুখে হাত বুলাইলেন—কোমল মাংসের উপরে শকুনির চঞ্চুপাত কল্পনা তাঁহার নিতান্ত দুঃসহ বোধ হইল। রঘুপতিকে প্রণাম করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বিদায় হইলেন। সে ঘর হইতে আলোক বাতাস ও জন কোলাহলের মধ্যে গিয়া নক্ষত্ররায় পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় নক্ষত্ররায়কে দেখিয়া ধ্রুব "কাকা' বলিয়া ছুটিয়া আসিল, দুটি ছোট হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া তাঁহার কপোলে কপোল দিয়া মুখের কাছে মুখ রাখিল। চুপি চুপি বলিল "কাকা।"

নক্ষত্র কহিলেন—"ছি, ও কথা বোলো না, আমি তোমার কাকা না।"

ধ্রুব তাঁহাকে এতকাল বরাবর কাকা বলিয়া আসিতেছিল, আজ সহসা বারণ শুনিয়া সে ভারি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—তার পরে নক্ষত্রের মুখের দিকে বড় বড় চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে?"

নক্ষত্র রায় কহিলেন "আমি তোমার কাকা নই।"

শুনিয়া সহসা ধ্রুবের অত্যন্ত হাসি পাইল—এত বড় অসম্ভব কথা সে ইতিপূর্ব্বে আর কখনই শুনে নাই—সে

হাসিয়া বলিল "তুমি কাকা!" নক্ষত্র যত নিষেধ করিতে লাগিলেন, সে ততই বলিতে লাগিল "তুমি কাকা।" তাহার হাসিও তত উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। সে নক্ষত্ররায়কে কাকা বলিয়া ক্ষেপাইতে লাগিল। নক্ষত্র বলিলেন "ধ্রুব তোমার দিদিকে দেখিতে যাইবে?"

ধ্রুব তাড়াতাড়ি নক্ষত্রের গলা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল "দিদি কোথায়?"

নক্ষত্র বলিলেন "মায়ের কাছে।"

ধ্রুব কহিল—"মা কোথায়?"

নক্ষত্র—"মা আছেন এক জায়গায়। আমি সেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।"

ধ্রুব হাততালি দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কখন্ নিয়ে যাবে কাকা?"

নক্ষত্র—"এখনি।"

ধ্রুব আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিয়া সজোরে নক্ষত্রের গলা জড়াইয়া ধরিল। নক্ষত্র তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চাদরে আচ্ছাদন করিয়া গুপ্ত দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

আজ রাত্রেও পথে লোক বাহির হওয়া নিষেধ। এই জন্য পথে প্রহরী নাই, পথিক নাই। আকাশে পূর্ণচন্দ্র।

মন্দিরে গিয়া নক্ষত্র রায় ধ্রুবকে রঘুপতির হাতে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। রঘুপতিকে দেখিয়া ধ্রুব সবলে

নক্ষত্র রায়কে জড়াইয়া ধরিল কোন মতে ছাড়িতে চাহিল না। রঘুপতি তাহাকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইলেন। ধ্রুব "কাকা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্র রায়ের চখে জল আসিল—কিন্তু রঘুপতির কাছে এই হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দেখাইতে তাঁহার নিতান্ত লজ্জা করিতে লাগিল। তিনি ভাণ করিলেন যেন তিনি পাষাণে গঠিত। তখন ধ্রুব কাঁদিয়া কাঁদিয়া "দিদি" "দিদি" বলিয়া ডাকিতে লাগিল, দিদি আসিল না। রঘুপতি বজ্রস্বরে এক ধমক দিয়া উঠিলেন। ভয়ে ধ্রুবের কান্না থামিয়া গেল। কেবল তাহার কান্না ফাটিয়া ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। চতুর্দ্দশ দেবমূর্ত্তি চাহিয়া রহিল।

গোবিন্দমাণিক্য নিশীথে স্বপ্নে ক্রন্দন শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন। সহসা শুনিতে পাইলেন, তাহার বাতায়নের নীচে হইতে কে কাতর স্বরে ডাকিতেছে "মহারাজ—মহারাজ!"

রাজা সত্বর উঠিয়া গিয়া চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলেন—ধ্রুবের পিতৃব্য কেদারেশ্বর। জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে!"

কেদারেশ্বর কহিলেন—"মহারাজ, আমার ধ্রুব কোথায়?"

রাজা কহিলেন—"কেন, তাহার শয্যাতে নাই!"

"না।"

কেদারেশ্বর বলিতে লাগিলেন—"অপরাহ্ন হইতে ধ্রুবকে না দেখিতে পাওয়ায় জিজ্ঞাসা করাতে যুবরাজ নক্ষত্ররায়ের ভৃত্য কহিল ধ্রুব অন্তঃপুরে যুবরাজের কাছে আছে—শুনিয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। অনেক রাত হইতে দেখিয়া আমার আশঙ্কা জন্মিল—অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, যুবরাজ নক্ষত্ররায় প্রাসাদে নাই আমি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রহরীরা কিছুতেই আমার কথা গ্রাহ্য করিল না—এই জন্য বাতায়নের নীচে হইতে মহারাজকে ডাকিয়াছি, আপনার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছি, আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

রাজার মনে একটা ভাব বিদ্যুতের মত চমকিয়া উঠিল। তিনি চারিজন প্রহরীকে ডাকিলেন, কহিলেন "সশস্ত্রে আমার অনুসরণ কর।"

একজন কহিল "মহারাজ, আজ রাত্রে পথে বাহির হওয়া নিষেধ।"

রাজা কহিলেন "আমি আদেশ করিতেছি!"

কেদারেশ্বর সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইলেন, রাজা তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে কহিলেন। বিজন পথে চন্দ্রালোকে রাজা মন্দিরাভিমুখে চলিলেন।

মন্দিরের দ্বার যখন সহসা খুলিয়া গেল—দেখা গেল খড়্গ সম্মুখে করিয়া নক্ষত্র এবং রঘুপতি মদ্যপান করি-

তেছেন। আলোক অধিক নাই—একটি দীপ জ্বলিতেছে। ধ্রুব কোথায়? ধ্রুব কালী প্রতিমার পায়ের কাছে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—তাহার কপোলের অশ্রু রেখা শুকাইয়া গেছে—ঠোঁট দুটি একটু খুলিয়া গেছে—মুখে ভয় নাই, ভাবনা নাই—এ যেন পাষাণ শয্যা নয়, যেন সে দিদির কোলের উপরে শুইয়া আছে। দিদি যেন চুমো খাইয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়াছে!

মদ খাইয়া নক্ষত্রের প্রাণ খুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু রঘুপতি স্থির হইয়া বসিয়া পূজার লগ্নের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন—নক্ষত্রের প্রলাপে কিছু মাত্র কান দিতে ছিলেন না। নক্ষত্র বলিতেছিলেন—"ঠাকুর, তোমার মনে মনে ভয় হচ্চে। তুমি মনে কর্‌চ আমিও ভয় কর্‌চি!" কিছু ভয় নেই ঠাকুর! ভয় কিসের! ভয় কা'কে! আমি তোমাকে রক্ষা কর্‌ব। তুমি কি মনে কর আমি রাজাকে ভয় করি! আমি সাসুজাকে ভয় করিনে আমি সাজাহানকে ভয় করিনে! ঠাকুর তুমি বল্লে না কেন, আমি রাজাকে ধরে আন্‌তুম্‌, দেবীকে সন্তুষ্ট করে দেওয়া যেত! ওইটুকু ছেলের কতটুকুই বা রক্ত!"

এমন সময়ে সহসা মন্দিরের ভিত্তির উপরে ছায়া পড়িল। নক্ষত্ররায় পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন রাজা। চকিতের মধ্যে নেশা সম্পূর্ণ ছুটিয়া গেল! নিজের ছায়ার চেয়ে নিজে মলিন হইয়া গেলেন। দ্রুতবেগে নিদ্রিত

ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইয়া গোবিন্দমাণিক্য প্রহরীদিগকে কহিলেন "ইহাদের দুজনকে বন্দী কর।"

চারিজন প্রহরী রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের দুই হাত ধরিল। ধ্রুবকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বিজন পথে জ্যোৎস্নালোকে রাজা প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। রঘুপতি ও নক্ষত্ররায় সে রাত্রে কারাগারে রহিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

তাহার পরদিন বিচার। বিচারশালা লোকে লোকারণ্য। বিচারাসনে রাজা বসিয়াছেন, সভাসদেরা চারিদিকে বসিয়াছেন। সম্মুখে দুইজন বন্দী। কাহারও হাতে শৃঙ্খল নাই। কেবল সশস্ত্র প্রহরী তাঁহাদিগকে ঘেরিয়া আছে। রঘুপতি পাষাণ মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া আছেন--নক্ষত্র রায়ের মাথা নত।

রঘুপতির দোষ সপ্রমাণ করিয়া রাজা তাঁহাকে বলিলেন—"তোমার কি বলিবার আছে !"

রঘুপতি কহিলেন—"আমাকে বিচার করিবার অধিকার আপনার নাই।"

রাজা কহিলেন—"তবে তোমার বিচার কে করিবে ?"

রঘুপতি—"আমি ব্রাহ্মণ, আমি দেবসেবক, দেবতা আমার বিচার করিবেন।"

রাজা—"ঈশ্বর ত সকলেরই বিচার করিয়া থাকেন।

আমরা তাঁহার রাজদণ্ড। আমাদের দ্বারাই তিনি অপরাধীকে শাস্তিবিধান করিয়া থাকেন। পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার দিবার জন্য জগতে তাঁহার সহস্র অনুচর আছে। আমরাও তাহার একজন। সে কথা লইয়া আমি তোমার সহিত বিচার করিতে চাই না—আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—কাল সন্ধ্যাকালে বলির মানসে তুমি একটি শিশুকে হরণ করিয়াছিলে কি না?”

রঘুপতি কহিলেন—“হাঁ।”

রাজা কহিলেন—“তুমি অপরাধ স্বীকার করিতেছ?”

রঘুপতি—“অপরাধ! অপরাধ কিসের! আমি মায়ের আদেশ পালন করিতেছিলাম, মায়ের কার্য্য করিতেছিলাম, তুমি তাহার ব্যাঘাৎ করিয়াছ—অপরাধ তুমি করিয়াছ—আমি মায়ের সমক্ষে তোমাকে অপরাধী করিতেছি তিনি তোমার বিচার করিবেন।”

রাজা তাঁহার কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন—“আমার রাজ্যের নিয়ম এই—যে ব্যক্তি দেবতার উদ্দেশে জীব বলি দিবে বা দিতে উদ্যত হইবে, তাহার নির্ব্বাসন দণ্ড। সেই দণ্ড আমি তোমার প্রতি প্রয়োগ করিলাম। আটবৎসরের জন্য তুমি নির্ব্বাসিত হইলে। প্রহরীরা তোমাকে আমার রাজ্যের বাহিরে রাখিয়া আসিবে।”

প্রহরীরা রঘুপতিকে সভাগৃহ হইতে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল।—রঘুপতি তাহাদিগকে কহিলেন “স্থির

হও।” রাজার দিকে চাহিয়া কহিলেন—“তোমার বিচার শেষ হইল, এখন আমি তোমার বিচার করিব, তুমি অবধান কর। চতুর্দ্দশ দেবতা পূজার দুই রাত্রে যে কেহ পথে বাহির হইবে, পুরোহিতের কাছে সে দণ্ডিত হইবে, এই আমাদের মন্দিরের নিয়ম। সেই প্রাচীন নিয়ম অনুসারে তুমি আমার নিকটে দণ্ডার্হ।”

রাজা কহিলেন—“আমি তোমার দণ্ডগ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।”

সভাসদেরা কহিলেন—“এ অপরাধের কেবল অর্থদণ্ড হইতে পারে।”

পুরোহিত কহিলেন—“আমি তোমার দুইলক্ষ মুদ্রা দণ্ড করিতেছি। এখনি দিতে হইবে।”

রাজা কিয়ৎক্ষণ ভাবিলেন—পরে বলিলেন “তথাস্তু।” কোষাধ্যক্ষকে ডাকিয়া দুই লক্ষ মুদ্রা আদেশ করিয়া দিলেন। প্রহরীরা রঘুপতিকে বাহিরে লইয়া গেল।

রঘুপতি চলিয়া গেলে নক্ষত্ররায়ের দিকে চাহিয়া রাজা দৃঢ়স্বরে কহিলেন “নক্ষত্ররায়, তোমার অপরাধ তুমি স্বীকার কর কি না?”

নক্ষত্ররায় বলিলেন “মহারাজ আমি অপরাধী, আমাকে মার্জ্জনা করুন!” বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া রাজার পা জড়াইয়া ধরিলেন।

মহারাজ বিচলিত হইলেন—কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল

না। অবশেষে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—“নক্ষত্ররায়, ওঠ, আমার কথা শোন। আমি মার্জ্জনা করিবার কে? আমি আপনার শাসনে আপনি রুদ্ধ। বন্দীও যেমন বদ্ধ বিচারকও তেমনি বদ্ধ। একই অপরাধে আমি একজনকে দণ্ড দিব, একজনকে মার্জ্জনা করিব, এ কি করিয়া হয়? তুমিই বিচার কর!”

সভাসদেরা বলিয়া উঠিল—“মহারাজ, নক্ষত্ররায় আপনার ভাই, আপনার ভাইকে মার্জ্জনা করুন্।”

রাজা দৃঢ়স্বরে কহিলেন “তোমরা সকলে চুপ কর। যতক্ষণ আমি এই আসনে আছি, ততক্ষণ আমি কাহারও ভাই নহি, কাহারও বন্ধু নহি।”

সভাসদেরা চারিদিকে চুপ করিলেন। রাজা গম্ভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন—“তোমরা সকলেই শুনিয়াছ—আমার রাজ্যের নিয়ম এই যে—যে ব্যক্তি দেবতার উদ্দেশে জীব বলি দিবে, বা দিতে উদ্যত হইবে তাহার নির্ব্বাসন দণ্ড। কাল সন্ধ্যাকালে নক্ষত্ররায় পুরোহিতের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বলির মানসে একটি শিশুকে হরণ করিয়াছিলেন। এই অপরাধ সপ্রমাণ হওয়াতে আমি তাঁহার আট বৎসর নির্ব্বাসন দণ্ডবিধান করিলাম।”

প্রহরীরা যখন নক্ষত্ররায়কে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল, তখন রাজা আসন হইতে নামিয়া নক্ষত্ররায়কে আলিঙ্গন করিলেন, রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন “বৎস, কেবল

তোমার দণ্ড হইল না, আমারও দণ্ড হইল। না জানি পূর্ব্বজন্মে কি অপরাধ করিয়াছিলাম! যতদিন তুমি বন্ধুদের কাছ হইতে দূরে থাকিবে, দেবতা তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন, তোমার মঙ্গল করুন!”

সংবাদ দেখিতে দেখিতে রাষ্ট্র হইল। অন্তঃপুরে ক্রন্দন-ধ্বনি উঠিল। রাজা নিভৃত কক্ষে দ্বাররুদ্ধ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। যোড়হাতে কহিতে লাগিলেন—“প্রভু, আমি যদি কখনও অপরাধ করি, আমাকে মার্জ্জনা করিও না, আমাকে কিছুমাত্র দয়া করিও না। আমাকে আমার পাপের শাস্তি দাও। পাপ করিয়া শাস্তি বহন করা যায় কিন্তু মার্জ্জনা ভার বহন করা যায় না প্রভু!”

নক্ষত্ররায়ের প্রেম রাজার মনে দ্বিগুণ জাগিতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ের ছেলেবেলাকার মুখ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। সে যে সকল খেলা করিয়াছে, কথা কহিয়াছে, কাজ করিয়াছে, তাহা একে একে তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল। একেকটা দিন, একেকটা রাত্রি, তাহার সূর্য্যালোকের মধ্যে তাহার তারাখচিত আকাশের মধ্যে শিশু নক্ষত্ররায়কে লইয়া তাঁহার সম্মুখে উদয় হইল। রাজার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

নির্ব্বাসনোদ্যত রঘুপতিকে যখন প্রহরীরা জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, কোন্‌দিকে যাইবেন?" তখন রঘুপতি উত্তর করিলেন "পশ্চিম দিকে যাইব।"

নয় দিন পশ্চিমমুখে যাত্রার পর বন্দী ও প্রহরীরা ঢাকা সহরের কাছাকাছি আসিয়া পৌছিল। তখন প্রহরীরা রঘুপতিকে ছাড়িয়া দিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিল।

রঘুপতি মনে মনে বলিলেন "কলিতে ব্রহ্মশাপ ফলে না—দেখা যাক্ ব্রাহ্মণের বুদ্ধিতে কতটা হয়! দেখা যাক্, গোবিন্দমাণিক্যই বা কেমন রাজা, আর আমিই বা কেমন পুরোহিত ঠাকুর!"

ত্রিপুরার প্রান্তে মন্দিরের কোণে মোগল রাজ্যের সংবাদ বড় পৌছিত না। এই নিমিত্ত রঘুপতি ঢাকা সহরে গিয়া মোগলদিগের রীতি নীতি ও রাজ্যের অবস্থা জানিতে কৌতূহলী হইলেন।

তখন মোগল সম্রাট শাজাহানের রাজত্বকাল। তখন তাঁহার তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর আক্রমণে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুজা বাঙ্গালার অধিপতি ছিলেন—রাজমহলে তাঁহার রাজধানী। কনিষ্ঠ-

পুত্র কুমার মুরাদ গুজরাটের শাসনকর্ত্তা। জ্যেষ্ঠ যুবরাজ দারা রাজধানী দিল্লিতেই বাস করিতেছেন। সম্রাটের বয়স ৬৭ বৎসর। তাঁহার শরীর অসুস্থ বলিয়া দারার উপরেই সাম্রাজ্যের ভার পড়িয়াছে।

রঘুপতি কিয়ৎকাল ঢাকায় বাস করিয়া উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করিলেন—ও অবশেষে রাজমহল অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজমহলে যখন পৌঁছিলেন তখন ভারতবর্ষে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। সংবাদ রাষ্ট্র হইয়াছে যে শাজাহান মৃত্যুশয্যায় শয়ান। এই সংবাদ পাইবামাত্র সুজা সৈন্য সহিত দিল্লি অভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন। সম্রাটের চারিপুত্রই মুমূর্ষু শাজাহানের মাথার উপর হইতে মুকুটটা একেবারে ছোঁ মারিয়া উড়াইয়া লইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ অরাজক রাজমহল ত্যাগ করিয়া সুজার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। লোকজন, বাহক প্রভৃতিদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। সঙ্গে যে দুই লক্ষ টাকা ছিল তাহা রাজমহলের নিকটবর্ত্তী এক বিজন প্রান্তরে পুঁতিয়া ফেলিলেন। তাহার উপরে এক চিহ্ন রাখিয়া গেলেন। অতি অল্প টাকাই সঙ্গে লইলেন। দগ্ধ কুটীর, পরিত্যক্ত গ্রাম, মর্দ্দিত শস্যক্ষেত্র লক্ষ্য করিয়া রঘুপতি অবিশ্রাম অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রঘুপতি সন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন। কিন্তু সন্যাসীর বেশ সত্ত্বেও আতিথ্য পাওয়া দুর্ঘট। কারণ পঙ্গপালের ন্যায় সৈন্যেরা যে পথ দিয়া

চলিয়া গিয়াছে, তাহার উভয়পার্শ্বে কেবল দুর্ভিক্ষ বিরাজ করিতেছে। সৈন্যেরা অশ্ব ও হস্তীপালের জন্য অপক্ক শস্য কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। কৃষকের মরাইয়ে একটি কণা অবশিষ্ট নাই। চারিদিকে কেবল লুণ্ঠনাবশিষ্ট বিশৃঙ্খলা। অধিকাংশ লোক গ্রাম ছাড়িয়া পালাইয়াছে। দৈবাৎ যে দুয়েক জনকে দেখা যায় তাহাদের মুখে হাস্য নাই। তাহারা চকিত হরিণের ন্যায় সতর্ক, কাহাকেও তাহারা বিশ্বাস করে না, দয়া করে না। বিজন পথের পার্শ্বে গাছের তলায় লাঠিহাতে দুইচারি জনকে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়—পথিক শিকারের জন্য তাহারা সমস্ত দিন অপেক্ষা করিয়া আছে। ধূমকেতুর পশ্চাদ্বর্ত্তী উল্কারাশির ন্যায় দস্যুরা সৈনিকদের অনুসরণ করিয়া লুণ্ঠনাবশেষ লুঠিয়া লইয়া যায়। এমন কি, মৃত দেহের উপর শৃগাল কুকুরের ন্যায় মাঝে মাঝে সৈন্য দল ও দস্যুদলে লড়াই বাধিয়া যায়। নিষ্ঠুরতা সৈন্যদের খেলা হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী নিরীহ পথিকের পেটে থপ্ করিয়া একটা তলোয়ারের খোঁচা বসাইয়া দেওয়া বা তাহার মুণ্ড হইতে পাগ্‌ড়ি সমেত খানিকটা খুলি উড়াইয়া দেওয়া তাহারা সামান্য উপহাস মাত্র মনে করে। গ্রামের লোকেরা তাহাদের দেখিয়া ভয় পাইতেছে দেখিলে তাহাদের পরম কৌতুক বোধ হয়। লুণ্ঠনাবশেষে তাহারা গ্রামের লোকদের উৎপীড়ন করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। দুই জন মান্য ব্রাহ্মণকে পিঠে

পিঠে সংলগ্ন করিয়া টিকিতে টিকিতে বাঁধিয়া উভয়ের নাকে নস্য প্রয়োগ করে। দুই ঘোড়ার পিঠে এক জন মানুষকে চড়াইয়া ঘোড়া দুটাকে চাবুক মারে দুই ঘোড়া দুই বিপরীত দিকে ছুটিয়া যায়, মাঝখানে মানুষটা পড়িয়া গিয়া হাত পা ভাঙ্গে। এইরূপ প্রতিদিন নূতন নূতন খেলা তাহারা আবিষ্কার করে। অকারণে গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়া যায়। বলে যে বাদশাহের সম্মানার্থে বাজি পুড়াইতেছে। সৈন্যদের পথে এইরূপ অত্যাচারের শত শত চিহ্ন পড়িয়া আছে। এখানে রঘুপতি আতিথ্য পাই-বেন কোথায়! কোন দিন অনাহারে কোন দিন স্বল্পাহারে কাটিতে লাগিল। রাত্রে অন্ধকারে এক ভগ্ন পরিত্যক্ত কুটীরে শ্রান্তদেহে শয়ন করিয়াছিলেন, সকালে উঠিয়া দেখেন এক ছিন্নশির মৃতদেহকে সমস্তরাত্রি বালিশ করিয়া শুইয়াছিলেন। একদিন মধ্যাহ্নে রঘুপতি ক্ষুধিত হইয়া কোন কুটীরে গিয়া দেখিলেন একজন লোক তাহার ভাঙ্গা খোলা সিন্ধুকের উপরে হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে, বোধ হয় তাহার লুণ্ঠিত ধনের জন্য শোক করিতেছিল, কাছে গিয়া ঠেলিতেই সে গড়াইয়া পড়িয়া গেল। মৃত দেহ মাত্র—তাহার জীবন অনেককাল হইল চলিয়া গিয়াছে।

একদিন রঘুপতি এক কুটীরে শুইয়া আছেন।—রাত্রি অবসান হয় নাই। প্রহরখানেক বিলম্ব আছে। এমন সময়ে ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া গেল। শরতের চন্দ্রালোকের

সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ছায়া ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। ফিস্ ফিস্ শব্দ শুনা গেল। রঘুপতি চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। তিনি উঠিতেই কতকগুলি স্ত্রীকণ্ঠ সভয়ে বলিয়া উঠিল—"ও মা গো!" একজন পুরুষ অগ্রসর হইয়া বলিল—"কোন্ হায় রে!"

রঘুপতি কহিলেন "আমি ব্রাহ্মণ, পথিক। তোমরা কে?"

"আমাদের এই ঘর! আমরা ঘর ছাড়িয়া পালাইয়াছিলাম। মোগল সৈন্য চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া তবে এখানে আসিয়াছি।"

রঘুপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "মোগল সৈন্য কোন্‌দিকে গিয়াছে।"

তাহারা কহিল "বিজয় গড়ের দিকে। এতক্ষণ বিজয় গড়ের বনেব মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।"

রঘুপতি আর অধিক কিছু না বলিয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিজয়গড়ের দীর্ঘ বন ঠগীদের আড্ডা। বনের মধ্যে দিয়া যে পথ গিয়াছে, সেই পথের দুই পার্শ্বে কত মনুষ্য কঙ্কাল নিহিত আছে, তাহাদের উপরে কেবল বনফুল ফুটিতেছে, আর কোন চিহ্ন নাই। বনের মধ্যে বট আছে,

বাব্‌লা আছে, নীম আছে, শত শত প্রকারের লতা ও গুল্ম আছে। স্থানে স্থানে ডোবা অথবা পুকুরের মত দেখা যায়। অবিশ্রাম পাতা পচিয়া পচিয়া তাহার জল একেবারে সবুজ হইয়া উঠিয়াছে। ছোট ছোট সুঁড়ি পথ এদিকে ওদিকে আঁকিয়া বাঁকিয়া সাপের মত অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। গাছের ডালে ডালে পালে পালে হনুমান। বটগাছের ডালের উপর হইতে শত শত শিকড় এবং হনুমানের লেজ ঝুলিতেছে। ভাঙ্গা মন্দিরের প্রাঙ্গনে শিউলি ফুলের গাছ শাদা শাদা ফুলে এবং হনুমানের দন্তবিকাশে একেবারে আচ্ছন্ন। সন্ধ্যাবেলায় বড় বড় ঝাঁক্‌ড়া গাছের উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পাখীর চীৎকারে অন্ধকার বনের ঘোর অন্ধকার যেন দীর্ণ বিদীর্ণ হইতে থাকে। আজ এই বৃহৎ বনের মধ্যে প্রায় কুড়ি-হাজার সৈন্য প্রবেশ করিয়াছে। এই ডালে পালায় লতায় পাতায় তৃণে গুল্মে জড়িত বৃহৎ গোলাকার অরণ্য, কুড়ি হাজার খর-নখ-চঞ্চু সৈনিক বাজপক্ষীদের একটিমাত্র নীড় বলিয়া বোধ হইতেছে। সৈন্য সমাগম দেখিয়া অসংখ্য কাক কা কা করিয়া দল বাঁধিয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াই-তেছে—সাহস করিয়া ডালের উপর আসিয়া বসিতেছে না। কোন প্রকার গোলমাল করিতে সেনাপতির নিষেধ আছে। সৈন্যেরা সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যাবেলায় বনে আসিয়া শুষ্ক-কাঠ কুড়াইয়া রন্ধন করিতেছে ও পরস্পর চুপি চুপি কথা

কহিতেছে—তাহাদের সেই গুন্ গুন্ শব্দে সমস্ত অরণ্য গম্‌গম্ করিতেছে, সন্ধ্যাবেলার ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাইতেছে না। গাছের গুঁড়িতে বাঁধা অশ্বেরা মাঝে মাঝে ক্ষুর দিয়া মাটি খুঁড়িতেছে ও হ্রেষাধ্বনি করিয়া উঠিতেছে—সমস্ত বনের তাহাতে চমক লাগিতেছে। ভাঙ্গা মন্দিরের কাছে ফাঁকা জায়গায় শা সুজার শিবির পড়িয়াছে। আর সকলের আজ বৃক্ষতলেই অবস্থান।

সমস্তদিন অবিশ্রাম চলিয়া রঘুপতি যখন বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন রাত্রি হইয়াছে। অধিকাংশ সৈন্য নিস্তব্ধে ঘুমাইতেছে, অল্প মাত্র সৈন্য নীরবে পাহারা দিতেছে। মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় আগুন জ্বলিতেছে—অন্ধকার যেন বহু কষ্টে নিদ্রাক্রান্ত রাঙা চক্ষু মেলিয়াছে। রঘুপতি বনের মধ্যে পা দিয়াই কুড়িহাজার সৈনিকের নিশ্বাস প্রশ্বাস যেন শুনিতে পাইলেন। বনের সহস্র গাছ শাখা বিস্তার করিয়া পাহারা দিতেছে। কালপেচক তাহার সদ্যোজাত শাবকের উপরে যেমন বক্ষ প্রসারিত করিয়া বসিয়া থাকে, তেমনি অরণ্যের বাহিরকার বিরাট রাত্রি অরণ্যের ভিতরকার গাঢ়তর রাত্রির উপর চাপিয়া ডানা ঝাঁপিয়া নীরবে বসিয়া আছে—অরণ্যের ভিতরে একরাত্রি মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইয়া আছে, অরণ্যের বাহিরে একরাত্রি মাথা তুলিয়া জাগিয়া আছে। রঘুপতি সে রাত্রে বনপ্রান্তে শুইয়া রহিলেন।

সকালে গোটাছুইচার খোঁচা খাইয়া ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া উঠিলেন। দেখিলেন জনকত পাগড়ি-বাঁধা দাড়ি-পরিপূর্ণ তুরাণী সৈন্য বিদেশী ভাষায় তাঁহাকে কি বলিতেছে, শুনিয়া তিনি নিশ্চয় অনুমান করিয়া লইলেন গালি। তিনিও বঙ্গভাষায় তাহাদের শ্যালক সম্বন্ধ প্রচার করিয়া দিলেন। তাহারা তাঁহাকে টানাটানি করিতে লাগিল। রঘুপতি বলিলেন "ঠাট্টা পেয়েছিস্?" কিন্তু তাহাদের আচরণে ঠাট্টার লক্ষণ কিছুমাত্র প্রকাশ পাইল না। বনের মধ্যদিয়া তাহারা তাঁহাকে অকাতরে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তিনি সবিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"টানাটানি কর কেন? আমি আপনিই যাচ্চি। এত পথ আমি এলুম কি করতে?" সৈন্যেরা হাসিতে লাগিল ও তাঁহার বাঙ্গালা কথা নকল করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিস্তর সৈন্য জড় হইল, তাঁহাকে লইয়া ভারি গোল পড়িয়া গেল। উৎপীড়নেরও সীমা রহিল না। একজন সৈন্য একটা কাঠবিড়ালীর লেজ ধরিয়া তাঁহার মুণ্ডিত মাথায় ছাড়িয়া দিল—দেখিবার ইচ্ছা, ফল মনে করিয়া খায় কি না। এক জন সৈন্য তাঁহার নাকের সম্মুখে একটা মোটা বেত বাঁকাইয়া ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল, সেটা ছাড়িয়া দিলে রঘুপতির মুখের উপর হইতে নাকের সমুন্নত মহিমা একেবারে সমূলে লোপ হইবার সম্ভাবনা। সৈন্যদের হাস্যে কানন

ধ্বনিত হইতে লাগিল। মধ্যাহ্নে আজ যুদ্ধ করিতে হইবে, সকালে তাই রঘুপতিকে লইয়া তাহাদের ভারি খেলা পড়িয়া গেল। খেলার সাধ মিটিলে পর ব্রাহ্মণকে সুজার শিবিরে লইয়া গেল।

সুজাকে দেখিয়া রঘুপতি সেলাম করিলেন না। তিনি দেবতা ও স্ববর্ণ ছাড়া আর কাহারও কাছে কখনও মাথা নত করেন নাই। মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—হাত তুলিয়া বলিলেন "শাহেন শার জয় হউক!" সুজা মদের পেয়ালা লইয়া সভাসদ সমেত বসিয়াছিলেন; আলস্য-বিজড়িত স্বরে নিতান্ত উপেক্ষা ভরে কহিলেন—"কি, ব্যাপার কি?"

সৈন্যেরা কহিল "জনাব, শত্রুপক্ষের চর গোপনে আমাদের বলাবল জানিতে আসিয়াছিল, আমরা তাহাকে প্রভুর কাছে ধরিয়া আনিয়াছি।"

সুজা কহিলেন "আচ্ছা আচ্ছা; বেচারা দেখিতে আসিয়াছে, উহাকে ভাল করিয়া সমস্ত দেখাইয়া ছাড়িয়া দাও। দেশে গিয়া গল্প করিবে।"

রঘুপতি বদ্ হিন্দুস্থানীতে কহিলেন "সরকারের অধীনে আমি কর্ম্ম প্রার্থনা করি।"

সুজা আলস্য ভরে হাত নাড়িয়া তাঁহাকে দ্রুত চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। বলিলেন "গরম।" যে বাতাস করিতেছিল, সে দ্বিগুণ জোরে বাতাস করিতে লাগিল।

দারা তাঁহার পুত্র সুলেমানকে রাজা জয়সিংহের অধীনে সুজার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের বৃহৎ সৈন্যদল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, সংবাদ আসিয়াছে। তাই বিজয়গড়ের কেল্লা অধিকার করিয়া সেইখানে সৈন্য সমবেত করিবার জন্য সুজা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন সুজার হাতে কেল্লা এবং সরকারী খাজানা সমর্পণ করিবার প্রস্তাব লইয়া বিজয়গড়ের অধিপতি বিক্রমসিংহের নিকট দূত গিয়াছিল। বিক্রমসিংহ সেই দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন—"আমি কেবল দিল্লীশ্বর শাজাহান এবং জগদীশ্বর ভবানীপতিকে জানি, সুজা কে? আমি তাহাকে জানি না।"

সুজা জড়িতস্বরে কহিলেন—"ভারি বেয়াদব! নাহক আবার লড়াই করিতে হইবে! ভারি হাঙ্গাম!"

রঘুপতি এই সমস্ত শুনিতে পাইলেন। সৈন্যদের হাত এড়াইবামাত্র বিজয়গড়ের দিকে চলিয়া গেলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাহাড়ের উপরে বিজয়গড়। বিজয়গড়ের অরণ্য গড়ের কাছাকাছি গিয়া শেষ হইয়াছে। অরণ্য হইতে বাহির হইয়া রঘুপতি সহসা দেখিলেন দীর্ঘ পাষাণ দুর্গ যেন নীল আকাশে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অরণ্য যেমন তাহার সহস্র তরুজালে প্রচ্ছন্ন, দুর্গ তেমনি আপনার

পাষাণের মধ্যে আপনি রুদ্ধ। অরণ্য সাবধানী, দুর্গ সতর্ক। অরণ্য ব্যাঘ্রের মত গুঁড়ি মারিয়া লেজ পাকাইয়া বসিয়া আছে, দুর্গ সিংহের মত কেশর ফুলাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অরণ্য মাটিতে কান পাতিয়া শুনিতেছে, দুর্গ আকাশে মাথা তুলিয়া দেখিতেছে।

রঘুপতি অরণ্য হইতে বাহির হইবামাত্র দুর্গপ্রাকারের উপরে সৈন্যেরা সচকিত হইয়া উঠিল। শৃঙ্গ বাজিয়া উঠিল। দুর্গ যেন সহসা সিংহনাদ করিয়া দাঁত নখ মেলিয়া ভ্রূকুটি করিয়া দাঁড়াইল। রঘুপতি পৈতা দেখাইয়া হাত তুলিয়া ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যেরা সতর্ক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রঘুপতি যখন দুর্গ-প্রাচীরের কাছাকাছি গেলেন, তখন সৈন্যেরা জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল "তুমি কে?" রঘুপতি বলিলেন "আমি ব্রাহ্মণ, অতিথি।"

দুর্গাধিপতি বিক্রমসিংহ পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ। দেবতা ব্রাহ্মণ ও অতিথি সেবায় নিযুক্ত। পৈতা থাকিলে দুর্গ প্রবেশের জন্য আর কোন পরিচয়ের আবশ্যক ছিল না। কিন্তু আজ যুদ্ধের দিনে কি করা উচিত সৈন্যেরা ভাবিয়া পাইতে-ছিল না। রঘুপতি কহিলেন "তোমরা আশ্রয় না দিলে মুসলমানদের হাতে আমাকে মরিতে হইবে।" বিক্রম-সিংহের কানে যখন এ কথা গেল তখন তিনি ব্রাহ্মণকে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় দিতে অনুমতি করিলেন। প্রাচীরের

উপর হইতে একটা মই নামান' হইল, রঘুপতি দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দুর্গের মধ্যে যুদ্ধের প্রতীক্ষায় সকলেই নিতান্ত ব্যস্ত বৃদ্ধ খুড়া সাহেব ব্রাহ্মণ অভ্যর্থনার ভার স্বয়ং লইলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম খড়্গ সিং কিন্তু তাঁহাকে কেহ বলে খুড়াসাহেব, কেহ বলে সুবাদার সাহেব—কেন যে বলে তাহার কোন কারণ পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নাই, ভাই নাই, তাঁহার খুড়া হইবার কোন অধিকার বা সুদূর সম্ভাবনা নাই—এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যতগুলি তাঁহার সুবা তাহার অপেক্ষা অধিক নহে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার উপাধি সম্বন্ধে কোন প্রকার আপত্তি অথবা সন্দেহ উত্থাপিত করে নাই। যাহারা বিনা ভাইপোয় খুড়া, বিনা সুবায় সুবাদার, সংসারের অনিত্যতা ও লক্ষ্মীর চপলতা নিবন্ধন তাহাদের পদচ্যুতির কোন আশঙ্কা নাই।

খুড়াসাহেব আসিয়া কহিলেন "বাহবা, এইত ব্রাহ্মণ বটে!" বলিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। রঘুপতির একপ্রকার তেজিয়ান দীপ্তশিখার মত আকৃতি ছিল, যাহা দেখিয়া সহসা পতঙ্গেরা মুগ্ধ হইয়া যাইত।

খুড়াসাহেব জগতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন "ঠাকুর, তেমন ব্রাহ্মণ আজ কাল ক'টা মেলে!"

রঘুপতি কহিলেন "অতি অল্প।"

খুড়াসাহেব কহিলেন "আগে ব্রাহ্মণের মুখে অগ্নি ছিল এখন সমস্ত অগ্নি জঠরে আশ্রয় লইয়াছে।"

রঘুপতি কহিলেন "তাও কি আগেকার মত আছে!"

খুড়াসাহেব মাথা নাড়িয়া কহিলেন "ঠিক কথা! অগস্ত্যমুনি যে আন্দাজ পান করিয়াছিলেন সে আন্দাজ যদি আহার করিতেন তাহা হইলে একবার বুঝিয়া দেখুন।"

রঘুপতি কহিলেন "আরও দৃষ্টান্ত আছে।"

খুড়াসাহেব—"হাঁ আছে বৈ কি! জহ্নুমুনির পিপাসার কথা শুনা যায় তাঁহার ক্ষুধার কথা কোথাও লেখে নাই কিন্তু একটা অনুমান করা যাইতে পারে। হর্ত্তকী খাইলেই যে কম খাওয়া হয় তাহা নহে, ক'টা করিয়া হর্ত্তকী তাঁহারা রোজ খাইতেন তাহার একটা হিসাব থাকিলে তবু বুঝিতে পারিতাম।"

রঘুপতি ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন "না সাহেব, আহারের প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট মনোযোগ ছিল না!"

খুড়াসাহেব জিভ কাটিয়া কহিলেন "রাম রাম, বলেন কি ঠাকুর! তাঁহাদের জঠরানল যে অত্যন্ত প্রবল ছিল তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। দেখুন্ না কেন, কালক্রমে আর সকল অগ্নিই নিবিয়া গেল, হোমের অগ্নিও আর জ্বলে না, কিন্তু"—

[illegible]কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন "হোমের অগ্নি আর জ্বলিবে কি করিয়া? দেশে ঘি রহিল কই? পাষণ্ডেরা সমস্ত গরু পার করিয়া দিতেছে, এখন হব্য পাওয়া যায় কোথায়? হোমাগ্নি না জ্বলিলে ব্রহ্মতেজ আর কত দিন টেকে!" বলিয়া রঘুপতি নিজের প্রচ্ছন্ন দাহিকাশক্তি অত্যন্ত অনুভব করিতে লাগিলেন।

খুড়াসাহেব কহিলেন "ঠিক বলিয়াছেন ঠাকুর, গরুগুলো মরিয়া আজকাল মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কাছ হইতে ঘি পাইবার প্রত্যাশা করা যায় না—মগজের সম্পূর্ণ অভাব! ঠাকুরের কোথা হইতে আসা হইতেছে!"

রঘুপতি কহিলেন "ত্রিপুরার রাজবাটি হইতে।"

বিজয়গড়ের বহিস্থিত ভারতবর্ষের ভূগোল অথবা ইতিহাস সম্বন্ধে খুড়াসাহেবের অতি যৎসামান্য জানা ছিল। বিজয়গড় ছাড়া ভারতবর্ষে জানিবার যোগ্য যে আর কিছু আছে তাহাও তাঁহার বিশ্বাস নহে। সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিলেন "আহা, ত্রিপুরার রাজা মস্ত রাজা।"

রঘুপতি তাঁহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন।

খুড়াসাহেব—"ঠাকুরের কি করা হয়?"

রঘুপতি "আমি ত্রিপুরার রাজপুরোহিত।"

খুড়াসাহেব চোখ বুজিয়া মাথা নাড়িয়া কহিলেন

"আহা!" রঘুপতির উপরে তাঁহার ভক্তি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। "কি করিতে আসা হইয়াছে!"

রঘুপতি কহিলেন "তীর্থ দর্শন করিতে!"

"ধুম্" করিয়া আওয়াজ হইল। শত্রুপক্ষ দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে। খুড়াসাহেব হাসিয়া চোখ টিপিয়া কহিলেন—"ও কিছু নয়, ঢেলা ছুঁড়িতেছে।" বিজয়গড়ের উপরে খুড়াসাহেবের বিশ্বাস যত দৃঢ় বিজয়গড়ের পাষাণ তত দৃঢ় নহে। বিদেশী পথিক দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিলেই খুড়াসাহেব তাহাকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসেন এবং বিজয়গড়ের মাহাত্ম্য তাহার মনে বদ্ধমূল করিয়া দেন। ত্রিপুরা রাজবাটি হইতে রঘুপতি আসিয়াছেন; এমন অতিথি সচরাচর মেলে না, খুড়াসাহেব অত্যন্ত উল্লাসে আছেন। অতিথির সঙ্গে বিজয়গড়ের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, ব্রহ্মার অণ্ড এবং বিজয়গড়ের দুর্গ যে প্রায় একই সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ঠিক মনুর পর হইতেই মহারাজ বিক্রমসিংহের পূর্ব্বপুরুষেরা যে এই দুর্গ ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। এই দুর্গের প্রতি শিবের কি বর আছে, এবং এই দুর্গে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন যে কিরূপে বন্দী হইয়াছিলেন তাহাও রঘুপতির অগোচর রহিল না।

সন্ধ্যার সময়ে সংবাদ পাওয়া গেল শত্রুপক্ষ দুর্গের

কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। তাহারা কামান পাতিয়াছিল কিন্তু কামানের গোলা দুর্গে আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। খুড়াসাহেব হাসিয়া রঘুপতির দিকে চাহিলেন। মর্ম্ম এই যে, দুর্গের প্রতি শিবের যে অমোঘ বর আছে তাহার এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কি হইতে পারে। বোধ করি, নন্দী স্বয়ং আসিয়া কামানের গোলাগুলি লুফিয়া লইয়া গিয়াছে কৈলাসে গণপতি ও কার্ত্তিকেয় ভাঁটা খেলিবেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

শাসুজাকে কোন মতে হস্তগত করাই রঘুপতির উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যখন শুনিলেন সুজা দুর্গ আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন মনে করিলেন মিত্রভাবে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি কোন রূপে সুজার দুর্গ আক্রমণে সাহায্য করিবেন—কিন্তু ব্রাহ্মণ যুদ্ধ বিগ্রহের কোন ধার ধারেন না, কি করিলে যে সুজার সাহায্য হইতে পারে কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

পরদিন আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিপক্ষ পক্ষ বারুদ দিয়া দুর্গ-প্রাচীরের কিয়দংশ উড়াইয়া দিল, কিন্তু ঘন ঘন গুলি বর্ষণের প্রভাবে দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিল না। ভগ্ন অংশ দেখিতে দেখিতে গাঁথিয়া তোলা হইল। আজ মাঝে মাঝে দুর্গের মধ্যে গোলাগুলি আসিয়া পড়িতে

লাগিল, দুই চারি জন করিয়া দুর্গ-সৈন্য হত ও আহত হইতে লাগিল।

"ঠাকুর, কিছু ভয় নাই, এ কেবল খেলা হইতেছে" বলিয়া খুড়া সাহেব রঘুপতিকে লইয়া দুর্গের চারিদিক দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কোথায় অস্ত্রাগার, কোথায় ভাণ্ডার, কোথায় আহতদের চিকিৎসাগৃহ, কোথায় বন্দী-শালা, কোথায় দরবার, এই সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইতে লাগিলেন ও বারবার রঘুপতির মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। রঘুপতি কহিলেন "চমৎকার কারখানা! ত্রিপুরার গড় ইহার কাছে লাগিতে পারে না। কিন্তু সাহেব, গোপনে পলায়নের জন্য ত্রিপুরার গড়ে একটি আশ্চর্য্য সুরঙ্গ পথ আছে, এখানে সেরূপ কিছুই দেখিতেছি না!"

খুড়াসাহেব কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, সহসা আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন "না এ দুর্গে সেরূপ কিছুই নাই।"

রঘুপতি নিতান্ত আশ্চর্য্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন "এত বড় দুর্গে একটা সুরঙ্গ পথ নাই, এ কেমন কথা হইল!"

খুড়াসাহেব কিছু কাতর হইয়া কহিলেন "নাই, এ কি হইতে পারে? অবশ্যই আছে, তবে আমরা হয়ত কেহ জানি না!"

রঘুপতি হাসিয়া কহিলেন “তবে ত না থাকারই মধ্যে। যখন আপনিই জানেন না তখন আর কেই বা জানে?”

খুড়াসাহেব অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তার পরে সহসা “হরি হে রাম রাম” বলিয়া তুড়ি দিয়া হাই তুলিলেন, তার পরে মুখে গোঁফে দাড়িতে দুই একবার হাত বুলাইয়া হঠাৎ বলিলেন “ঠাকুর, পূজা অর্চ্চনা লইয়া থাকেন আপনাকে বলিতে কোন দোষ নাই—দুর্গ প্রবেশের এবং দুর্গ হইতে বাহির হইবার দুইটা গোপন পথ আছে, কিন্তু বাহিরের কোন লোককে তাহা দেখান' নিষেধ।”

রঘুপতি কিঞ্চিৎ সন্দেহের স্বরে কহিলেন “বটে! তা হবে!”

খুড়াসাহেব দেখিলেন তাঁহারই দোষ, একবার “নাই” একবার “আছে” বলিলে লোকের স্বভাবতই সন্দেহ হইতে পারে। বিদেশীর চোখে ত্রিপুরার গড়ের কাছে বিজয়-গড় কোন অংশে খাটো হইয়া যাইবে ইহা খুড়াসাহেবের পক্ষে অসহ্য।

তিনি কহিলেন “ঠাকুর, বোধ করি, আপনার ত্রিপুরা অনেক দূরে এবং আপনি ব্রাহ্মণ, দেবসেবাই আপনার একমাত্র কাজ, আপনার দ্বারা কিছুই প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই!”

রঘুপতি কহিলেন “কাজ কি সাহেব, সন্দেহ হয় ত ও

সব কথা থাক্ না! আমি ব্রাহ্মণের ছেলে আমার দুর্গের খবরে কাজ কি!"

খুড়াসাহেব জিভ কাটিয়া কহিলেন "আরে রাম রাম, আপনাকে আবার সন্দেহ কিসের! চলুন্ একবার দেখাইয়া লইয়া আসি!"

এদিকে সহসা দুর্গের বাহিরে সুজার সেনাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। অরণ্যের মধ্যে সুজার শিবির ছিল, সুলেমান এবং জয়সিংহের সৈন্য আসিয়া সহসা তাঁহাকে বন্দী করিয়াছে, এবং অলক্ষ্যে দুর্গ আক্রমণকারীদের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। সুজার সৈন্যেরা লড়াই না করিয়া কুড়িটা কামান পশ্চাতে ফেলিয়া ভঙ্গ দিল।

দুর্গের মধ্যে ধুম পড়িয়া গেল। বিক্রম সিংহের নিকট সুলেমানের দূত পৌঁছিতেই তিনি দুর্গের দ্বার খুলিয়া দিলেন। স্বয়ং অগ্রসর হইয়া সুলেমান ও রাজা জয়সিংহকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। দিল্লীশ্বরের সৈন্য ও অশ্ব গজে দুর্গ পরিপূর্ণ হইয়া গেল! নিশান উড়িতে লাগিল, শঙ্খ ও রণবাদ্য বাজিতে লাগিল এবং খুড়াসাহেবের শ্বেত গুম্ফের নীচে শ্বেত হাস্য পরিপূর্ণ রূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

খুড়াসাহেবের কি আনন্দের দিন! আজ দিল্লীশ্বরের রাজপুত সৈন্যেরা বিজয়গড়ে অতিথি হইয়াছে—প্রবল

প্রতাপান্বিত শা সুজা আজ বিজয়গড়ের বন্দী। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পর হইতে বিজয়গড়ে এমন বন্দী আর মেলে নাই। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বন্ধন দশা স্মরণ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া খুড়াসাহেব রাজপুত সুচেৎসিংহকে বলিলেন "মনে করিয়া দেখ হাজারটা হাতে শিকলি পরাইতে কি আয়োজনটাই করিতে হইয়াছিল! কলিযুগ পড়িয়া অবধি ধূমধাম বিল্‌কুল্ কমিয়া গিয়াছে। রাজার ছেলেই হউক্ আর বাদশাহের ছেলেই হউক্ বাজারে দুখানার বেশী হাত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাঁধিয়া সুখ নাই!"

সুচেৎ সিং হাসিয়া নিজের হাতের দিকে চাহিয়া কহিলেন "এই দুইখানা হাতই যথেষ্ট!"

খুড়াসাহেব কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন "তা বটে, সে কালে কাজ ছিল ঢের বেশী। আজ কাল কাজ এত কম পড়িয়াছে যে এই দুই খানা হাতেরই কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া যায় না। আরো হাত থাকিলে আরও গোঁফে তা' দিতে হইত।"

আজ খুড়াসাহেবের বেশ ভূষার ত্রুটি ছিল না। চিবুকের নীচে হইতে পাকা দাড়ি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহার দুই কানে লট্‌কাইয়া দিয়াছেন। গোঁফ যোড়া পাকাইয়া কর্ণরন্ধ্রের কাছাকাছি লইয়া গিয়াছেন। মাথায় বাঁকা পাগ্‌ড়ি, কটিদেশে বাঁকা তলোয়ার। জরির জুতার সম্মুখ ভাগ শিঙের মত বাঁকিয়া পাকাইয়া উঠিয়াছে। আজ খুড়াসাহেবর চলিবার এম্‌নি ভঙ্গী, যেন বিজয়গড়ের মহিমা

তাঁহারই সর্ব্বাঙ্গে তরঙ্গিত হইতেছে। আজ এই সমস্ত সমজ্দার লোকের নিকটে বিজয়গড়ের মাহাত্ম্য প্রমাণ হইয়া যাইবে এই আনন্দে তাঁহার আহার নিদ্রা নাই।

সুচেৎ সিংকে লইয়া প্রায় সমস্তদিন দুর্গ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। সুচেৎ সিং যেখানে কোন প্রকার আশ্চর্য্য প্রকাশ না করেন সেখানে খুড়াসাহেব স্বয়ং "বাহবা, বাহবা" করিয়া নিজের উৎসাহ রাজপুত বীরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা করেন। বিশেষতঃ দুর্গ প্রাকারের গাঁথুনি সম্বন্ধে তাঁহাকে সবিশেষ পরিশ্রম করিতে হইল। দুর্গ প্রাকার যেরূপ অবিচলিত সুচেৎ সিংহও ততোধিক—তাঁহার মুখে কোন প্রকারই ভাব প্রকাশ পাইল না। খুড়াসাহেব ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাকে একবার দুর্গ প্রাকারের বামে একবার দক্ষিণে, একবার উপরে একবার নীচে আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিলেন—বারবার বলিতে লাগিলেন "কি তারিফ!" কিন্তু কিছুতেই সুচেৎ সিংহের হৃদয় দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্ত হইয়া সুচেৎ সিং বলিয়া উঠিলেন "আমি ভরতপুরের গড় দেখিয়াছি আর কোনও গড় আমার চোখে লাগেই না!"

খুড়াসাহেব কাহারও সঙ্গে কখনও বিবাদ করেন না—নিতান্ত ম্লান হইয়া বলিলেন "অবশ্য—অবশ্য! একথা বলিতে পার বটে!"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া দুর্গ সম্বন্ধে আলোচনা পরিত্যাগ

করিলেন। বিক্রম সিংহের পূর্ব্বপুরুষ দুর্গা সিংহের কথা উঠাইলেন। তিনি বলিলেন—"দুর্গা সিংহের তিন পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র চিত্র সিংহের এক আশ্চর্য্য অভ্যাস ছিল। তিনি প্রতি দিন প্রাতে আধসের আন্দাজ ছোলা দুধে সিদ্ধ করিয়া খাইতেন। তাঁহার শরীরও তেমনি ছিল।—আচ্ছা জি তুমি যে ভরতপুরের গড়ের কথা বলিতেছ, সে অবশ্য খুব মস্ত গড়ই হইবে—কিন্তু কৈ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ত তাহার কোন উল্লেখ নাই!"

সুচেৎ সিং হাসিয়া কহিলেন "তাহার জন্য কাজের কোন ব্যাঘাত হইতেছে না!"

খুড়াসাহেব ঈষৎ কষ্টে হাসিয়া বলিলেন "হা হা হা তা ঠিক, তা ঠিক!—তবে কি জান ত্রিপুরার গড়ও বড় কম গড় নহে কিন্তু বিজয়গড়ের"—

সুচেৎ সিং—"ত্রিপুরা আবার কোন্ মুল্লুকে?"

খুড়াসাহেব—"সে ভারি মুল্লুক! অত কথায় কাজ কি, সেথানকার রাজপুরোহিত ঠাকুর আমাদের গড়ে অতিথি আছেন, তুমি তাঁহার মুখে সমস্ত শুনিবে!"

কিন্তু ব্রাহ্মণকে আজ কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। খুড়াসাহেবের প্রাণ সেই ব্রাহ্মণের জন্য কাঁদিতে লাগিল। তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন "এই রাজপুত গ্রাম্যগুলোর চেয়ে সে ব্রাহ্মণ অনেক ভাল।" সুচেৎ সিংহের নিকটে শতমুখে রঘুপতির প্রশংসা করিতে লাগি-

লেন এবং এই বিজয়গড় সম্বন্ধে রঘুপতির কি মত তাহাও ব্যক্ত করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

খুড়াসাহেবের হাত এড়াইতে সুচেৎ সিংকে আর অধিক প্রয়াস পাইতে হইল না। কাল প্রাতে বন্দীসমেত সম্রাট সৈন্যের যাত্রার দিন স্থির হইয়াছে, যাত্রার আয়োজনে সৈন্যেরা নিযুক্ত হইল। বন্দীশালায় শা সুজা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে কহিতেছেন "ইহারা কি বেয়াদব! শিবির হইতে আমার আল্‌বোলাটা আনিয়া দিবে, তাহাও ইহাদের মনে উদয় হইল না!"

বিজয় গড়ের পাহাড়ের নিম্নভাগে এক গভীর খাল আছে। সেই খালের ধারে এক স্থানে একটি বজ্রদগ্ধ অশথের গুঁড়ি আছে। সেই গুঁড়ির কাছ-বরাবর রঘুপতি গভীর রাত্রে ডুব দিলেন ও অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

গোপনে দুর্গপ্রবেশের জন্য যে সুরঙ্গ পথ আছে এই খালের গভীর তলেই তাহার প্রবেশের মুখ। এই পথ বাহিয়া সুরঙ্গ প্রান্তে পৌঁছিয়া নীচে হইতে সবলে ঠেলিলেই একটি পাথর উঠিয়া পড়ে, উপর হইতে তাহাকে কিছুতেই উঠান যায় না। সুতরাং যাহারা দুর্গের ভিতরে আছে তাহারা এ পথ দিয়া বাহির হইতে পারে না।

বন্দীশালার পালঙ্কের উপরে সুজা নিদ্রিত। পালঙ্ক

ছাড়া গৃহে আর কোন সজ্জা নাই। একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। সহসা গৃহে ছিদ্র প্রকাশ পাইল। অল্পে অল্পে মাথা তুলিয়া পাতাল হইতে রঘুপতি উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজা। সিক্ত বস্ত্র হইতে জলধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। রঘুপতি ধীরে ধীরে সুজাকে স্পর্শ করিলেন।

সুজা চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু রগ্‌ড়াইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন তার পরে আলস্য-জড়িত স্বরে কহিলেন—"কি হাঙ্গাম! ইহারা কি আমাকে রাত্রেও ঘুমাইতে দিবে না! তোমাদের ব্যবহারে আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি।"

রঘুপতি মৃদুস্বরে কহিলেন—"শাহাজাদা, উঠিতে আজ্ঞা হউক। আমি সেই ব্রাহ্মণ। আমাকে স্মরণ করিয়া দেখুন। ভবিষ্যতেও আমাকে স্মরণে রাখিবেন।"

পরদিন প্রাতে সম্রাট সৈন্য যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। সুজাকে নিদ্রা হইতে জাগাইবার জন্য রাজা জয়সিংহ স্বয়ং বন্দীশালায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সুজা তখনো শয্যা হইতে উঠেন নাই। কাছে গিয়া স্পর্শ করিলেন। দেখিলেন, সুজা নহে, তাঁহার বস্ত্র পড়িয়া আছে। সুজা নাই। ঘরের মেজের উপরে সুরঙ্গ গহ্বর, তাহার প্রস্তর আবরণ উন্মুক্ত পড়িয়া আছে।

বন্দীর পলায়ন বার্ত্তা দুর্গে রাষ্ট্র হইল। সন্ধানের জন্য চারিদিকে লোক ছুটিল। রাজা বিক্রমসিংহের শির নত

হইল। বন্দী কিরূপে পলাইল, তাহার বিচারের জন্য সভা বসিল।

খুড়াসাহেবের সেই গর্ব্বিত সহর্ষ ভাব কোথায় গেল। তিনি পাগলের মত "ব্রাহ্মণ কোথায়" "ব্রাহ্মণ কোথায়" করিয়া রঘুপতিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। ব্রাহ্মণ কোথাও নাই। পাগড়ি খুলিয়া খুড়া সাহেব কিছুকাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন। সুচেৎসিং পাশে আসিয়া বসিলেন কহিলেন—"খুড়াসাহেব, কি আশ্চর্য্য কারখানা। এ কি সমস্ত ভূতের কাণ্ড?" খুড়াসাহেব বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন—"না—এ ভূতের কাণ্ড নয় সুচেৎ সিং এ একজন নিতান্ত নির্ব্বোধ বৃদ্ধের কাণ্ড ও আরেকজন বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ডের কাজ!"

সুচেৎ সিং আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন "তুমি যদি তাহাদের জানই তবে তাহাদের গ্রেফ্‌তার করিয়া দাও না কেন?"

খুড়াসাহেব কহিলেন "তাহাদের মধ্যে একজন পালাইয়াছে। আরেকজনকে গ্রেফ্‌তার করিয়া রাজসভায় লইয়া যাইতেছি।" বলিয়া পাগ্‌ড়ি পরিলেন ও সভার বেশ করিলেন।

সভায় তখন প্রহরীদের সাক্ষ্য লওয়া হইতেছিল। খুড়াসাহেব নতশিরে সভায় প্রবেশ করিলেন। বিক্রম সিংহের পদতলে তলোয়ার খুলিয়া রাখিয়া কহিলেন—"আমাকে বন্দী করিতে আদেশ করুন, আমি অপরাধী!"

রাজা বিস্মিত হইয়া কহিলেন "খুড়াসাহেব, ব্যাপার কি!"

খুড়াসাহেব কহিলেন "সেই ব্রাহ্মণ। এ সমস্ত সেই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কাজ!"

রাজা জয়সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে!"

খুড়াসাহেব কহিলেন "আমি বিজয়গড়ের বৃদ্ধ খুড়াসাহেব।"

জয়সিংহ—"তুমি কি করিয়াছ?"

খুড়াসাহেব—"আমি বিজয়গড়ের সন্ধান ভেদ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছি। আমি নিতান্ত নির্ব্বোধের মত বিশ্বাস করিয়া বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে সুরঙ্গপথের কথা বলিয়াছিলাম"—

বিক্রমসিংহ সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন "খড়গ্ সিং!"

খুড়াসাহেব চমকিয়া উঠিলেন—তিনি প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার নাম খড়গ্ সিং।

বিক্রম সিংহ কহিলেন "খড়গ্ সিং, এতদিন পরে তুমি কি আবার শিশু হইয়াছ!"

খুড়া সাহেব নতশিরে চুপ করিয়া রহিলেন।

বিক্রম সিং—"খুড়াসাহেব, তুমি এই কাজ করিলে? তোমার হাতে আজ বিজয়গড়ের অপমান হইল!"

খুড়াসাহেব চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার

হাত থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কম্পিত হস্তে কপাল স্পর্শ করিয়া মনে মনে কহিলেন "অদৃষ্ট!"

বিক্রম সিংহ কহিলেন "আমার দুর্গ হইতে দিল্লীশ্বরের শত্রু পলায়ন করিল! জান, তুমি আমাকে দিল্লীশ্বরের নিকটে অপরাধী করিয়াছ!"

খুড়াসাহেব কহিলেন "আমিই একা অপরাধী। মহারাজ অপরাধী এ কথা দিল্লীশ্বর বিশ্বাস করিবেন না।"

বিক্রম সিং বিরক্ত হইয়া কহিলেন "তুমি কে! তোমার খবর দিল্লীশ্বর কি রাখেন! তুমি ত আমারই লোক। এ যেন আমি নিজের হাতে বন্দীর বন্ধন মোচন করিয়া দিয়াছি!"

খুড়াসাহেব নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তিনি চোখের জল আর সামলাইতে পারিলেন না।

বিক্রম সিংহ কহিলেন "তোমাকে কি দণ্ড দিব!"

খুড়াসাহেব—"মহারাজের যেমন ইচ্ছা!"

বিক্রম সিং—"তুমি বুড়ামানুষ, তোমাকে অধিক আর কি দণ্ড দিব! নির্ব্বাসন দণ্ডই তোমার পক্ষে যথেষ্ট।"

খুড়াসাহেব বিক্রম সিংহের পা জড়াইয়া ধরিলেন, কহিলেন "বিজয়গড় হইতে নির্ব্বাসন! না মহারাজ। আমি বৃদ্ধ, আমার মতিভ্রম হইয়াছিল। আমাকে বিজয়গড়েই মরিতে দিন। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ করিয়া দিন। এই বুড়া-

বয়সে শেয়াল কুকুরের মত আমাকে বিজয়গড় হইতে খেদাইয়া দিবেন না !”

রাজা জয়সিংহ কহিলেন “মহারাজ, আমার অনুরোধে ইহার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি সম্রাটকে সমস্ত অবস্থা অবগত করিব।”

খুড়াসাহেবের মার্জ্জনা হইল। সভা হইতে বাহির হই-বার সময় খুড়াসাহেব কাঁপিয়া পড়িয়া গেলেন। সে দিন হইতে খুড়াসাহেবকে আর বড় দেখা যাইত না। তিনি ঘর হইতে বাহির হইতেন না। তাঁহার মেরুদণ্ড যেন ভাঙ্গিয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

গুজুরপাড়া ব্রহ্মপুত্রের তীরে ক্ষুদ্র গ্রাম। একজন ক্ষুদ্র জমিদার আছেন—নাম পীতাম্বর রায়—বাসন্দা অধিক নাই। পীতাম্বর আপনার পুরাতন চণ্ডিমণ্ডপে বসিয়া আপনাকে রাজা বলিয়া থাকেন। তাঁহার প্রজারাও তাঁহাকে রাজা বলিয়া থাকে। তাঁহার রাজ-মহিমা এই আম্রপিয়ালবনবেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রামটুকুর মধ্যেই বিরাজমান। তাঁহার যশ এই গ্রামের নিকুঞ্জগুলির মধ্যে ধ্বনিত হইয়া এই গ্রামের সীমানার মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। জগ-তের বড় বড় রাজাধিরাজের প্রখর প্রতাপ এই ছায়াময় নীড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না। কেবল, তীর্থ

স্নানের উদ্দেশে নদী তীরে ত্রিপুরার রাজাদের এক বৃহৎ প্রাসাদ আছে, কিন্তু অনেক কাল হইতে রাজারা কেহ স্নানে আসেন নাই, সুতরাং ত্রিপুরার রাজার সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা অস্পষ্ট জনশ্রুতি প্রচলিত আছে মাত্র।

একদিন ভাদ্রমাসের দিনে গ্রামে সংবাদ আসিল ত্রিপুরার এক রাজকুমার নদীতীরের পুরাতন প্রাসাদে বাস করিতে আসিতেছেন। কিছু দিন পরে বিস্তর পাগড়িবাঁধা লোক আসিয়া প্রাসাদে ভারি ধূম লাগাইয়া দিল। তাহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে হাতি ঘোড়া লোক লস্কর লইয়া স্বয়ং নক্ষত্র রায় গুজুরপাড়া গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমারোহ দেখিয়া গ্রামবাসীদের মুখে যেন রা সরিল না। পীতাম্বরকে এত দিন ভারি রাজা বলিয়া মনে হইত কিন্তু আজ আর তাহা কাহারও মনে হইল না—নক্ষত্ররায়কে দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিল "হাঁ রাজপুত্র এই রকমই হয় বটে!"

এইরূপে পীতাম্বর তাঁহার পাকা দালান ও চণ্ডিমণ্ডপসুদ্ধ একেবারে লুপ্ত হইয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। নক্ষত্ররায়কে তিনি এম্‌নি রাজা বলিয়া অনুভব করিলেন যে নিজের ক্ষুদ্র রাজমহিমা নক্ষত্ররায়ের চরণে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া তিনি পরম সুখী হইলেন। নক্ষত্ররায় কদাচিৎ হাতি চড়িয়া

বাহির হইলে পীতাম্বর আপনার প্রজাদের ডাকিয়া বলিতেন "রাজা দেখেছিস্? ঐ দেখ্ রাজা দেখ্!" মাছ তরকারী আহার্য্য দ্রব্য উপহার লইয়া পীতাম্বর প্রতিদিন নক্ষত্ররায়কে দেখিয়া আসিতেন—নক্ষত্ররায়ের তরুণ সুন্দর মুখ দেখিয়া পীতাম্বরের স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। নক্ষত্ররায়ই গ্রামের রাজা হইয়া উঠিলেন। পীতাম্বর প্রজাদের মধ্যে গিয়া ভর্ত্তি হইলেন।

প্রতিদিন তিন বেলা নহবৎ বাজিতে লাগিল, গ্রামের পথে হাতি ঘোড়া চলিতে লাগিল, রাজদ্বারে মুক্ত তরবারির বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল, হাটবাজার বসিয়া গেল। পীতাম্বর এবং তাঁহার প্রজারা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। নক্ষত্ররায় এই নির্ব্বাসনের রাজা হইয়া উঠিয়া সমস্ত দুঃখ ভুলিলেন। এখানে রাজত্বের ভার কিছুমাত্র নাই অথচ রাজত্বের সুখ সম্পূর্ণ আছে। এখানে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বদেশে তাঁহার এত প্রবল প্রতাপ ছিল না। তাহা ছাড়া, এখানে রঘুপতির ছায়া নাই। মনের উল্লাসে নক্ষত্ররায় বিলাসে মগ্ন হইলেন। ঢাকা নগরী হইতে নটনটী আসিল, নৃত্যগীতবাদ্যে নক্ষত্ররায়ের তিলেক অরুচি নাই।

নক্ষত্ররায় ত্রিপুরার রাজ অনুষ্ঠান সমস্তই অবলম্বন করিলেন। ভৃত্যদের মধ্যে কাহারও নাম রাখিলেন মন্ত্রী, কাহারও নাম রাখিলেন সেনাপতি, পীতাম্বর দেওয়ানজি নামে চলিত হইলেন। রীতিমত রাজদরবার বসিত।

নক্ষত্ররায় পরম আড়ম্বরে বিচার করিতেন। নকুড় আসিয়া নালিশ করিল "মথুর আমায় 'কুত্তো' ক'য়েছে" তাহার বিধিমত বিচার বসিল। বিবিধ প্রমাণ সংগ্রহের পর মথুর দোষী সাব্যস্ত হইলে নক্ষত্ররায় পরম গম্ভীর ভাবে বিচারাসন হইতে আদেশ করিলেন—নকুড় মথুরকে দুই কানমলা দেয়। এইরূপে সুখে সময় কাটিতে লাগিল। এক এক দিন হাতে নিতান্ত কাজ না থাকিলে সৃষ্টিছাড়া একটা কোন নূতন আমোদ উদ্ভাবনের জন্য মন্ত্রীকে তলব পড়িত। মন্ত্রী রাজসভাসদদিগকে সমবেত করিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন ব্যাকুলভাবে নূতন খেলা বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, গভীর চিন্তা এবং পরামর্শের অবধি থাকিত না। এক দিন সৈন্য সামন্ত লইয়া পীতাম্বরের চণ্ডিমণ্ডপ আক্রমণ করা হইয়াছিল—এবং তাঁহার পুকুর হইতে মাছ ও তাঁহার বাগান হইতে ডাব ও পালংশাক লুঠের দ্রব্যের স্বরূপ অত্যন্ত ধুম করিয়া বাদ্য বাজাইয়া প্রাসাদে আনা হইয়াছিল। এইরূপ খেলাতে নক্ষত্ররায়ের প্রতি পীতাম্বরের স্নেহ আরও গাঢ় হইত।

আজ প্রাসাদে বিড়াল শাবকের বিবাহ। নক্ষত্ররায়ের একটি শিশু বিড়ালী ছিল, তাহার সহিত মণ্ডলদের বিড়ালের বিবাহ হইবে। চূড়োমণি ঘটক ঘটকালির স্বরূপ তিন শত টাকা ও একটা শাল পাইয়াছে। গায়ে-হলুদ প্রভৃতি সমস্ত উপক্রমণিকা হইয়া গিয়াছে। আজ শুভ-

লগ্নে সন্ধ্যার সময়ে বিবাহ হইবে। এ কয়দিন রাজবাটিতে কাহারও তিলার্দ্ধ অবসর নাই।

সন্ধ্যার সময় পথঘাট আলোকিত হইল, নহবৎ বসিল। মণ্ডলদের বাড়ি হইতে চতুর্দ্দোলায় চড়িয়া কিঙ্খাবের বেশ পরিয়া পাত্র অতি কাতর স্বরে মিউ মিউ করিতে করিতে যাত্রা করিয়াছে। মণ্ডলদের বাড়ির ছোট ছেলেটি মিৎবরের মত তাহার গলার দড়িটি ধরিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। উলু-শঙ্খধ্বনির মধ্যে পাত্র সভাস্থ হইল। পুরোহিতের নাম কেনারাম—কিন্তু নক্ষত্ররায় তাহার নাম রাখিয়াছেন রঘুপতি। নক্ষত্ররায় আসল রঘুপতিকে ভয় করিতেন এই জন্য নকল রঘুপতিকে লইয়া খেলা করিয়া সুখী হইতেন—এমন কি, কথায় কথায় তাহাকে উৎপীড়ন করিতেন—গরীব কেনারাম সমস্ত নীরবে সহ্য করিত। আজ দৈবদুর্ব্বিপাকে কেনারাম সভায় অনুপস্থিত—তাহার ছেলেটি জ্বরবিকারে মরিতেছে। নক্ষত্ররায় অধীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "রঘুপতি কোথায়।" ভৃত্য বলিল—"তাঁহার বাড়িতে ব্যাম।" নক্ষত্ররায় দ্বিগুণ হাঁকিয়া বলিলেন "বোলাও উস্‌কো।" লোক ছুটিল। ততক্ষণ রোরুদ্যমান বিড়ালের সমক্ষে নাচ গান চলিতে লাগিল। নক্ষত্ররায় বলিলেন "সাহানা গাও।" সাহানা গান আরম্ভ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভৃত্য আসিয়া নিবেদন করিল "রঘুপতি আসিয়াছেন।" নক্ষত্ররায় সরোষে বলিলেন

"থোলাও!" তৎক্ষণাৎ পুরোহিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। পুরোহিতকে দেখিয়াই নক্ষত্ররায়ের ভ্রূকুটি কোথায় মিলাইয়া গেল, তাঁহার সম্পূর্ণ ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, কপালে ঘর্ম্ম দেখা দিল। সাহানা গান, সারঙ্গ ও মৃদঙ্গ সহসা বন্ধ হইল, কেবল বিড়ালের কাতর মিউ মিউ ধ্বনি নিস্তব্ধ ঘরে দ্বিগুণ জাগিয়া উঠিল।

এ রঘুপতিই বটে। তাহার আর সন্দেহ নাই। দীর্ঘ, শীর্ণ, তেজস্বী, বহুদিনের ক্ষুধিত কুকুরের মত চক্ষু দুটো জ্বলিতেছে। ধূলায় পরিপূর্ণ দুই পা তিনি কিংখাব মছলন্দের উপর স্থাপন করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—"নক্ষত্ররায়!" নক্ষত্ররায় চুপ করিয়া রহিলেন। রঘুপতি বলিলেন—"তুমি রঘুপতিকে ডাকিয়াছ। আমি আসিয়াছি।" নক্ষত্ররায় অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন "ঠাকুর—ঠাকুর!" রঘুপতি কহিলেন "উঠিয়া এস!" নক্ষত্ররায় ধীরে ধীরে সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। বিড়ালের বিয়ে, সাহানা এবং সারং একেবারে বন্ধ হইল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

রঘুপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "এ সব কি হইতেছিল?"

নক্ষত্ররায় মাথা চুলকাইয়া কহিলেন "নাচ হইতেছিল।"

রঘুপতি ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া কহিলেন "ছী ছি!" নক্ষত্ররায় অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রঘুপতি কহিলেন "কাল এখান হইতে যাত্রা করিতে হইবে। তাহার উদ্যোগ কর।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "কোথায় যাইতে হইবে!"

রঘুপতি—"সে কথা পরে হইবে। আপাততঃ আমার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "আমি এখানে বেশ আছি।"

রঘুপতি—"বেশ আছি! তুমি রাজবংশে জন্মিয়াছ, তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা সকলে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। তুমি কি না আজ এই বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা হইয়া বসিয়াছ আর বলিতেছ 'বেশ আছি'!"

রঘুপতি তীব্রবাক্যে ও তীক্ষ্ণ কটাক্ষে প্রমাণ করিয়া দিলেন যে নক্ষত্ররায় ভাল নাই। নক্ষত্ররায়ও রঘুপতির মুখের তেজে কতকটা সেই রকমই বুঝিলেন। তিনি বলিলেন "বেশ আর কি এমনি আছি! কিন্তু আর কি করিব! উপায় কি আছে!"

রঘুপতি—"উপায় ঢের আছে—উপায়ের অভাব নাই। আমি তোমাকে উপায় দেখাইয়া দিব—তুমি আমার সঙ্গে চল।"

নক্ষত্ররায় "একবার দাওয়ান্‌জিকে জিজ্ঞাসা করি!"

রঘুপতি "না!"

নক্ষত্ররায়—"আমার এই সব জিনিষ পত্র—"

রঘুপতি "কিছু আবশ্যক নাই।"

নক্ষত্ররায়—"লোক জন—"

রঘুপতি—"দরকার নাই।"

নক্ষত্ররায়—"আমার হাতে এখন যথেষ্ট নগদ টাকা নাই।"

রঘুপতি—"আমার আছে। আর অধিক ওজর আপত্তি করিও না। আজ শয়ন করিতে যাও, কাল প্রাতঃকালেই যাত্রা করিতে হইবে।" বলিয়া রঘুপতি কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন।

তাহার পরদিন ভোরে নক্ষত্ররায় উঠিয়াছেন। তখন বন্দীরা ললিত রাগিণীতে মধুর গান গাহিতেছে। নক্ষত্র-রায় বহির্ভবনে আসিয়া জানলা হইতে বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন। পূর্ব্বতীরে সূর্য্যোদয় হইতেছে, অরুণ রেখা দেখা দিয়াছে। উভয়তীরের ঘন তরুস্রোতের মধ্য দিয়া, ছোট ছোট নিদ্রিত গ্রামগুলির দ্বারের কাছ দিয়া ব্রহ্মপুত্র তাহার বিপুল জলরাশি লইয়া অবাধে বহিয়া যাইতেছে। প্রাসাদের জানলা হইতে নদী তীরের একটি ছোট কুটীর দেখা যাইতেছে। একটি মেয়ে প্রাঙ্গন ঝাঁট দিতেছে—এক জন পুরুষ তাহার সঙ্গে দুই একটা কথা কহিয়া মাথায় চাদর বাঁধিয়া, একটা বড় বাঁশের লাঠির অগ্রভাগে পুঁটুলি বাঁধিয়া নিশ্চিন্তমনে কোথায় বাহির হইল। শ্যামা ও দোয়েল শিশ্ দিতেছে, বেনেবউ বড় কাঁঠালগাছের ঘন পল্লবের মধ্যে বসিয়া গান গাহিতেছে। বাতায়নে দাঁড়া-

ইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া নক্ষত্ররায়ের হৃদয় হইতে এক গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস উঠিল, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে রঘুপতি আসিয়া নক্ষত্ররায়কে স্পর্শ করিলেন। নক্ষত্ররায় চমকিয়া উঠিলেন। রঘুপতি মৃদুগম্ভীর স্বরে কহিলেন "যাত্রার সমস্ত প্রস্তুত।"

নক্ষত্ররায় যোড়হাতে অত্যন্ত কাতরস্বরে কহিলেন "ঠাকুর, আমাকে মাপ কর ঠাকুর—আমি কোথাও যাইতে চাহি না। আমি এখানে বেশ আছি।"

রঘুপতি একটি কথা না বলিয়া নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে তাঁহার অগ্নিদৃষ্টি স্থির রাখিলেন। নক্ষত্ররায় চোখ নামাইয়া কহিলেন "কোথায় যাইতে হইবে?"

রঘুপতি—"সে কথা এখন হইতে পারে না।"

নক্ষত্র—"দাদার বিরুদ্ধে আমি কোন চক্রান্ত করিতে পারিব না।"

রঘুপতি জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন "দাদা তোমার কি মহৎ উপকারটা করিয়াছেন শুনি!"

নক্ষত্র মুখ ফিরাইয়া, জানলার উপর আঁচড় কাটিয়া বলিলেন "আমি জানি, তিনি আমাকে ভাল বাসেন।"

রঘুপতি তীব্র শুষ্ক হাস্যের সহিত কহিলেন "হরি হরি, কি প্রেম! তাই বুঝি নির্ব্বিঘ্নে ধ্রুবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্যে মিছা ছুতা করিয়া দাদা তোমাকে রাজ্য হইতে তাড়াইতেছেন—পাছে রাজ্যের গুরুভারে ননীর

পুতলি স্নেহের ভাই কখনও ব্যথিত হইয়া পড়ে। সে রাজ্যে আর কি কখনও সহজে প্রবেশ করিতে পারিবে? নির্ব্বোধ!”

নক্ষত্ররায় তাড়াতাড়ি বলিলেন “আমি কি এই সামান্য কথাটা আর বুঝি না? আমি সমস্তই বুঝি—কিন্তু আমি কি করিব বল ঠাকুর, উপায় কি!”

রঘুপতি “সেই উপায়ের কথাইত হইতেছে। সেই জন্যইত আসিয়াছি। ইচ্ছা হয়ত আমার সঙ্গে চলিয়া আইস, নয়ত এই বাঁশবনের মধ্যে বসিয়া বসিয়া তোমার হিতাকাঙ্খী দাদার ধ্যান কর। আমি চলিলাম।”

বলিয়া রঘুপতি প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। নক্ষত্ররায় তাড়াতাড়ি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া কহিলেন “আমিও যাইব ঠাকুর, কিন্তু দেওয়ানজি যদি যাইতে চান তাঁহাকে আমাদের সঙ্গে লইয়া যাইতে কি আপত্তি আছে?”

রঘুপতি কহিলেন “আমি ছাড়া আর কেহ সঙ্গে যাইবে না।”

বাড়ি ছাড়িয়া নক্ষত্ররায়ের পা সরিতে চায় না। এই সমস্ত সুখের খেলা ছাড়িয়া, দেওয়ানজিকে ছাড়িয়া রঘুপতির সঙ্গে একলা কোথায় যাইতে হইবে! কিন্তু রঘুপতি যেন তাঁহার কেশ ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। তাহা ছাড়া নক্ষত্ররায়ের মনে এক প্রকার ভয়মিশ্রিত কৌতূহলও জন্মিতে লাগিল। তাহারও একটা ভীষণ আকর্ষণ আছে।

নৌকা প্রস্তুত আছে। নদীতীরে উপস্থিত হইয়া নক্ষত্র রায় দেখিলেন কাঁধে গামছা ফেলিয়া পীতাম্বর স্নান করিতে আসিতেছেন। নক্ষত্রকে দেখিয়াই পীতাম্বর হাস্য-বিক- শিত মুখে কহিলেন "জয়োস্তু মহারাজ, শুনিলাম্ না বি কাল কোথা হইতে এক অলক্ষণমন্ত বিটল ব্রাহ্মণ আসিয় শুভ বিবাহের ব্যাঘাত করিয়াছে!"

নক্ষত্ররায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। রঘুপতি গম্ভী ভাবে কহিলেন "আমিই সেই বিটল ব্রাহ্মণ।"

পীতাম্বর হাসিয়া উঠিলেন কহিলেন "তবে ত আপনা সাক্ষাতে আপনার বর্ণনা করাটা ভাল হয় নাই! জানি কোন্ পিতার পুত্র এমন্ কাজ করিত! কিছু মনে কবি বেন না ঠাকুর, অসাক্ষাতে লোকে কি না বলে! আমাকে যাহারা সমুখে বলে রাজা, তাহারা আড়ালে বলে পী মুখের সাম্‌নে কিছু না বলিলেই হইল, আমিত এই বুঝি। আসল কথা কি জানেন্ আপনার মুখটা কেমন ভাবি অপ্রসন্ন দেখাইতেছে, কাহারও এমন মুখের ভাব দেখিলে লোকে তাহার নামে নিন্দা রটায়! —মহারাজ এত প্রাতে যে নদীতীরে!"

নক্ষত্ররায় কিছু করুণ স্বরে কহিলেন "আমি যে চলি লাম দেওয়ানজি!"

পীতাম্বর—"চলিলেন? কোথায়? নপাড়ায়, মণ্ডল দের বাড়ি?"

নক্ষত্র "না দেওয়ানজি, মণ্ডলদের বাড়ি নয়। অনেক দূর।"

পীতা—"অনেক দূর? তবে কি পাইকঘাটায় শিকারে যাইতেছেন?"

নক্ষত্ররায় একবার রঘুপতির মুখের দিকে চাহিয়া কেবল বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় নাড়িলেন। রঘুপতি কহিলেন "বেলা বহিয়া যায়, নৌকায় উঠা হোক।" পীতাম্বর অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ও ক্রুদ্ধভাবে ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিলেন কহিলেন "তুমি কে হে ঠাকুর? আমাদের মহারাজাকে হুকুম কবিতে আসিয়াছ!"

নক্ষত্র ব্যস্ত হইয়া পীতাম্বরকে একপাশে টানিয়া লইয়া কহিলেন "উনি আমাদের গুরু ঠাকুর!"

পীতাম্বর বলিয়া উঠিলেন "হোক্‌না গুরু ঠাকুর! উনি আমাদেব চণ্ডীমণ্ডপে থাকুন, চাল কলা বরাদ্দ করিয়া দিব, সমাদরে থাকিবেন—মহারাজকে উঁহার কিসের আবশ্যক?"

রঘুপতি—"বৃথা সময় নষ্ট হইতেছে—আমি তবে চলিলাম।"

পীতাম্বর "যে আজ্ঞে, বিলম্বে ফল কি, মশায় চট্‌পট্‌ সরিয়া পড়ুন। মহারাজকে লইয়া আমি প্রাসাদে যাইতেছি।"

নক্ষত্ররায় একবার রঘুপতির মুখের দিকে চাহিয়া এক-

বার পীতাম্বরের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন "না দেওয়ানজি, আমি যাই।"

পীতাম্বর—"তবে আমিও যাই; লোক জন সঙ্গে লউন্। রাজার মত চলুন্। রাজা যাইবেন, সঙ্গে দেওয়ানজি যাইবে না?"

নক্ষত্ররায় কেবল রঘুপতির মুখের দিকে চাহিলেন। রঘুপতি কহিলেন "কেহ সঙ্গে যাইবে না।"

পীতাম্বর উগ্র হইয়া উঠিয়া কহিলেন—"দেখ ঠাকুর তুমি—" নক্ষত্ররায় তাঁহাকে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন "দেওয়ানজি, আমি যাই, দেরি হইতেছে।"

পীতাম্বর ম্লান হইয়া নক্ষত্রের হাত ধরিয়া কহিলেন "দেখ বাবা, আমি তোমাকে রাজা বলি, কিন্তু আমি তোমাকে সন্তানের মত ভালবাসি—আমার সন্তান কেহ নাই। তোমার উপর আমার জোর খাটে না। তুমি চলিয়া যাইতেছ, আমি জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারি না। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ এই আছে যেখানেই যাও আমি মরিবার আগে ফিরিয়া আসিতে হইবে। আমি স্বহস্তে আমার রাজত্ব সমস্ত তোমার হাতে দিয়া যাইব। আমার এই একটি সাধ আছে।"

নক্ষত্ররায় ও রঘুপতি নৌকায় উঠিলেন। নৌকা দক্ষিণ মুখে চলিয়া গেল। পীতাম্বর স্নান ভুলিয়া গামছা কাঁধে অন্যমনস্কে বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। গুজুরপাড়া যেন শূন্য

হইয়া গেল—তাহার আমোদ উৎসব সমস্ত অবসান। কেবল প্রতি দিন প্রকৃতির নিত্য উৎসব, প্রাতে পাখীর গান, পল্লবের মর্ম্মর ধ্বনি ও নদী তরঙ্গের করতালির বিরাম নাই।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

দীর্ঘ পথ। কোথাও বা নদী, কোথাও বা ঘন অরণ্য, কোথাও বা ছায়াহীন প্রান্তর—কখন বা নৌকায়, কখন বা পদব্রজে, কখন বা টাট্টু ঘোড়ায়—কখন রৌদ্র, কখন বৃষ্টি, কখন কোলাহলময় দিন, কখন নিশীথিনীর নিস্তব্ধ অন্ধকার—নক্ষত্ররায় অবিশ্রাম চলিয়াছেন। কত দেশ, কত বিচিত্র দৃশ্য, কত বিচিত্র লোক—কিন্তু নক্ষত্ররায়ের পার্শ্বে ছায়ার ন্যায় ক্ষীণ, রৌদ্রের ন্যায় দীপ্ত সেই একমাত্র রঘুপতি অবিশ্রাম লাগিয়া আছেন! দিনে রঘুপতি, রাত্রে রঘুপতি, স্বপ্নেও রঘুপতি বিরাজ করেন। পথে পথিকেরা যাতায়াত করিতেছে, পথপার্শ্বে ধূলায় ছেলেরা খেলা করিতেছে, হাটে শত শত লোক কেনাবেচা করিতেছে, গ্রামে বৃদ্ধেরা পাশা খেলিতেছে, ঘাটে মেয়েরা জল তুলিতেছে, নৌকায় মাঝীরা গান গাহিয়া চলিয়াছে—কিন্তু নক্ষত্ররায়ের পার্শ্বে এক শীর্ণ রঘুপতি সর্ব্বদা জাগিয়া আছে। জগতে চারিদিকে বিচিত্র খেলা হইতেছে, বিচিত্র ঘটনা ঘটিতেছে—কিন্তু এই রঙ্গভূমির বিচিত্র লীলার মাঝখান দিয়া নক্ষত্র

বার পীতাম্বরের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন "না দেওয়ানজি, আমি যাই।"

পীতাম্বর—"তবে আমিও যাই; লোক জন সঙ্গে লউন্। রাজার মত চলুন্। রাজা যাইবেন, সঙ্গে দেওয়ানজি যাইবে না?"

নক্ষত্ররায় কেবল রঘুপতির মুখের দিকে চাহিলেন। রঘুপতি কহিলেন "কেহ সঙ্গে যাইবে না।"

পীতাম্বর উগ্র হইয়া উঠিয়া কহিলেন—"দেখ ঠাকুর তুমি—" নক্ষত্ররায় তাঁহাকে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন "দেওয়ানজি, আমি যাই, দেরি হইতেছে।"

পীতাম্বর ম্লান হইয়া নক্ষত্রের হাত ধরিয়া কহিলেন "দেখ বাবা, আমি তোমাকে রাজা বলি, কিন্তু আমি তোমাকে সন্তানের মত ভালবাসি—আমার সন্তান কেহ নাই। তোমার উপর আমার জোর খাটে না। তুমি চলিয়া যাইতেছ, আমি জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারি না। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ এই আছে যেখানেই যাও আমি মরিবার আগে ফিরিয়া আসিতে হইবে। আমি স্বহস্তে আমার রাজত্ব সমস্ত তোমার হাতে দিয়া যাইব। আমার এই একটি সাধ আছে।"

নক্ষত্ররায় ও রঘুপতি নৌকায় উঠিলেন। নৌকা দক্ষিণ মুখে চলিয়া গেল। পীতাম্বর স্নান ভুলিয়া গামছা কাঁধে অন্যমনস্কে বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। গুজুবপাড়া যেন শূন্য

হইয়া গেল—তাহার আমোদ উৎসব সমস্ত অবসান। কেবল প্রতি দিন প্রকৃতির নিত্য উৎসব, প্রাতে পাখীর গান, পল্লবের মর্ম্মর ধ্বনি ও নদী তরঙ্গের করতালির বিরাম নাই।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

দীর্ঘ পথ। কোথাও বা নদী, কোথাও বা ঘন অরণ্য, কোথাও বা ছায়াহীন প্রান্তর—কখন বা নৌকায়, কখন বা পদব্রজে, কখন বা টাটু ঘোড়ায়—কখন রৌদ্র, কখন বৃষ্টি, কখন কোলাহলময় দিন, কখন নিশীথিনীর নিস্তব্ধ অন্ধকার—নক্ষত্ররায় অবিশ্রাম চলিয়াছেন। কত দেশ, কত বিচিত্র দৃশ্য, কত বিচিত্র লোক—কিন্তু নক্ষত্ররায়ের পার্শ্বে ছায়ার ন্যায় ক্ষীণ, রৌদ্রের ন্যায় দীপ্ত সেই একমাত্র রঘুপতি অবিশ্রাম লাগিয়া আছেন! দিনে রঘুপতি, রাত্রে রঘুপতি, স্বপ্নেও রঘুপতি বিরাজ করেন। পথে পথিকেরা যাতায়াত করিতেছে, পথপার্শ্বে ধূলায় ছেলেরা খেলা করিতেছে, হাটে শত শত লোক কেনাবেচা করিতেছে, গ্রামে বৃদ্ধেরা পাশা খেলিতেছে, ঘাটে মেয়েরা জল তুলিতেছে, নৌকায় মাঝীরা গান গাহিয়া চলিয়াছে—কিন্তু নক্ষত্ররায়ের পার্শ্বে এক শীর্ণ রঘুপতি সর্ব্বদা জাগিয়া আছে। জগতে চারিদিকে বিচিত্র খেলা হইতেছে, বিচিত্র ঘটনা ঘটিতেছে—কিন্তু এই রঙ্গভূমির বিচিত্র লীলার মাঝখান দিয়া নক্ষত্র

রায়ের দুরদৃষ্ট তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে—সজন তাঁহার পক্ষে বিজন, লোকালয় কেবল শূন্য মরুভূমি। নক্ষত্র রায় শ্রান্ত হইয়া তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী ছায়াকে জিজ্ঞাসা করেন "আর কতদূর যাইতে হইবে!" ছায়া উত্তর করে "অনেক দূর!" "কোথায় যাইতে হইবে?" তাহার উত্তর নাই। নক্ষত্ররায় নিশ্বাস ফেলিয়া চলিতে থাকেন। তরু-শ্রেণীর মধ্যে পাতা দিয়া ছাওয়া নিভৃত পরিচ্ছন্ন কুটীর দেখিলে তাঁহার মনে হয় আমি যদি এই কুটীরের অধিবাসী হইতাম! গোধূলীর সময় যখন রাখাল লাঠি কাঁধে করিয়া মাঠ দিয়া গ্রামপথ দিয়া ধূলা উড়াইয়া গোরু বাছুর লইয়া চলে, নক্ষত্ররায়ের মনে হয় "আমি যদি ইহার সঙ্গে যাইতে পাইতাম, সন্ধ্যাবেলায় গৃহে গিয়া বিশ্রাম করিতে পাইতাম?" মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড রৌদ্রে চাষা চাষ করিতেছে, তাহাকে দেখিয়া নক্ষত্ররায় মনে করেন "আহা এ কি সুখী!" পথকষ্টে নক্ষত্ররায় বিবর্ণ শীর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছেন—রঘুপতিকে বলেন "ঠাকুর, আমি আর বাঁচিব না"—রঘুপতি বলেন "এখন তোমাকে মরিতে দিবে কে!" নক্ষত্ররায়ের মনে হইল রঘুপতি অবকাশ না দিলে তাঁহার মরিবারও সুবিধা নাই। একজন স্ত্রীলোক নক্ষত্ররায়কে দেখিয়া বলিয়াছিল "আহা, কাদের ছেলে গো! এ'কে পথে কে বাহির করিয়াছে!" শুনিয়া নক্ষত্র রায়ের প্রাণ গলিয়া গেল, তাঁহার চোখে জল আসিল; তাঁহার ইচ্ছা করিল

সেই স্ত্রীলোকটিকে মা বলিয়া তাহার সঙ্গে তাহার ঘরে চলিয়া যান।

কিন্তু নক্ষত্ররায় রঘুপতির হাতে যতই কষ্ট পাইতে লাগিলেন রঘুপতির ততই বশ হইতে লাগিলেন—রঘুপতির অঙ্গুলির ইঙ্গিতে তাঁহার সমস্ত অস্তিত্ব পরিচালিত হইতে লাগিল!

চলিতে চলিতে ক্রমে নদীর বাহুল্য কমিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে ভূমি দৃঢ় হইয়া আসিল, মৃত্তিকা লোহিত বর্ণ, কঙ্করময়, লোকালয় দূরে দূরে স্থাপিত, গাছপালা বিরল; নারিকেল বনের দেশ ছাড়িয়া দুই পথিক তালবনের দেশে আসিয়া পড়িলেন। মাঝে মাঝে বড় বড় বাঁধ, শুষ্ক নদীর পথ, দূরে মেঘের মত পাহাড় দেখা যাইতেছে। ক্রমে শাসুজার রাজধানী রাজমহল নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

অবশেষে রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরাজয় ও পলায়নের পরে সুজা নূতন সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন—কিন্তু রাজ কোষে অধিক অর্থ নাই। প্রজাগণ করভারে পীড়িত। ইতিমধ্যে দারাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া ঔরংজের দিল্লির সিংহাসনে বসিয়াছেন। সুজা এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। কিন্তু সৈন্য সামন্ত কিছুই প্রস্তুত ছিল না—এই জন্য কিছু সময়

হাতে পাইবার আশায় তিনি ছল করিয়া ঔরঙ্গজেবের নিকট এক দূত পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া পাঠাইলেন যে নয়নের জ্যোতি হৃদয়ের আনন্দ পরম স্নেহাস্পদ প্রিয়তম ভ্রাতা ঔরঙ্গজেব সিংহাসন লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছেন ইহাতে সুজা মৃতদেহে প্রাণ পাইয়াছেন—এক্ষণে সুজার বাঙ্গলা শাসন ভার নূতন সম্রাট মঞ্জুর করিলেই আনন্দের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। ঔরঙ্গজেব অত্যন্ত সমাদরের সহিত দূতকে আহ্বান করিলেন। সুজার শরীর মনের স্বাস্থ্য, এবং সুজার পরিবারের মঙ্গল সংবাদ জানিবার জন্য সবিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন, এবং বলিলেন যখন স্বয়ং সম্রাট শাজাহান সুজাকে বাঙ্গলার শাসনকার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন, তখন আর দ্বিতীয় মঞ্জুরী পত্রের কোন আবশ্যক নাই।—এই সময়ে রঘুপতি সুজার সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুজা কৃতজ্ঞতা ও সমাদরের সহিত তাঁহার উদ্ধারকর্ত্তাকে আহ্বান করিলেন। বলিলেন "খবর কি?"

রঘুপতি বলিলেন "বাদশাহের কাছে কিছু নিবেদন আছে।"

সুজা মনে মনে ভাবিলেন "নিবেদন আবার কিসের? কিছু অর্থ চাহিয়া না বসিলে বাঁচি!"

রঘুপতি কহিলেন "আমার প্রার্থনা এই যে—"

সুজা কহিলেন—"ব্রাহ্মণ, তোমার প্রার্থনা আমি নিশ্চয়

পূরণ করিব। কিন্তু কিছু দিন সবুর কর। এখন রাজ-কোষে অধিক অর্থ নাই!”

রঘুপতি কহিলেন “শাহেন শা, রূপা সোনা বা আর কোন ধাতু চাহি না আমি এখন শাণিত ইস্পাত চাই। আমার নালিষ শুনুন্ আমি বিচার প্রার্থনা করি!”

সুজা কহিলেন “ভারি মুস্কিল। এখন আমার বিচার করিবার সময় নহে। ব্রাহ্মণ, তুমি বড় অসময়ে আসিয়াছ।”

রঘুপতি কহিলেন—“শাহজাদা, সময় অসময় সকলেরই আছে। আপনি বাদশাহ আপনারও আছে এবং আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমারও আছে। আপনার সময়মত আপনি বিচার করিতে বসিলে আমার সময় থাকে কোথা!”

সুজা হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন “ভারি হাঙ্গাম! এত কথা শোনার চেয়ে তোমার নালিশ শোনা ভাল! বলিয়া যাও!” –

রঘুপতি কহিলেন “ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দ মাণিক্য তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে বিনা অপরাধে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন—”

সুজা বিরক্ত হইয়া কহিলেন “ব্রাহ্মণ, তুমি পরের নালিষ লইয়া কেন আমার সময় নষ্ট করিতে আসিয়াছ! এখন এ সমস্ত বিচার করিবার সময় নয়!”

রঘুপতি কহিলেন “ফরিয়াদী রাজধানীতে হাজির আছেন।”

সুজা কহিলেন "তিনি আপনি উপস্থিত থাকিয়া আপনার মুখে যখন নালিশ উত্থাপন করিবেন তখন বিবেচনা করা যাইবে।"

রঘুপতি কহিলেন "তাঁহাকে কবে এখানে হাজির করিব!"

সুজা কহিলেন—"ব্রাহ্মণ কিছুতেই ছাড়ে না! আচ্ছা এক সপ্তাহ পরে আনিও!"

রঘুপতি কহিলেন "বাদশাহ যদি হুকুম করেন ত আমি তাঁহাকে কাল আনিব।"

সুজা বিরক্ত হইয়া কহিলেন "আচ্ছা কালই আনিও।" আজিকার মত নিষ্কৃতি পাইলেন। রঘুপতি বিদায় হইলেন।

নক্ষত্ররায় কহিলেন "নবাবের কাছে যাইব কিন্তু নজরের জন্য কি লইব!"

রঘুপতি কহিলেন "সে জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না।" নজরের জন্য তিনি দেড় লক্ষ মুদ্রা উপস্থিত করিলেন।

পরদিন প্রভাতে রঘুপতি কম্পিত হৃদয় নক্ষত্ররায়কে লইয়া সুজার সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যখন দেড় লক্ষ টাকা নবাবের পদতলে স্থাপিত হইল তখন তাঁহার মুখশ্রী তেমন অপ্রসন্ন বোধ হইল না। নক্ষত্ররায়ের নালিশ অতি সহজেই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি কহিলেন "এক্ষণে তোমাদের কি অভিপ্রায় আমাকে বল!"

রঘুপতি কহিলেন "গোবিন্দমাণিক্যকে নির্ব্বাসিত করিয়া তাঁহার স্থলে নক্ষত্ররায়কে রাজা করিয়া দিতে আজ্ঞা হৌক!"

যদিও সুজা নিজে ভ্রাতার সিংহাসনে হস্তক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না, তথাপি এস্থলে তাঁহার মনে কেমন আপত্তি উপস্থিত হইল। কিন্তু রঘুপতির প্রার্থনা পূরণ করাই তাঁহার আপাতত সকলের চেয়ে সহজ বোধ হইল—নহিলে রঘুপতি বিস্তর বকাবকি করিবে এই তাঁহার ভয়। বিশেষতঃ দেড় লক্ষ টাকা নজরের উপরেও অধিক আপত্তি করা ভাল দেখায় না এইরূপ তাঁহার মনে হইল। তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, গোবিন্দমাণিক্যের নির্ব্বাসন এবং নক্ষত্ররায়ের রাজ্যপ্রাপ্তির পরোয়ানাপত্র তোমাদের সঙ্গে দিব তোমরা লইয়া যাও!"

রঘুপতি কহিলেন "বাদশাহের কতিপয় সৈন্যও সঙ্গে দিতে হইবে!"

সুজা দৃঢ়স্বরে কহিলেন "না, না, না—তাহা হইবে না—যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে পারিব না।"

রঘুপতি কহিলেন "যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ আর ছত্রিশ হাজার টাকা আমি রাখিয়া যাইতেছি। এবং ত্রিপুরায় নক্ষত্ররায় রাজা হইবামাত্র এক বৎসরের খাজানা সেনাপতির হাত দিয়া পাঠাইয়া দিব।"

এ প্রস্তাব সুজার অতিশয় যুক্তিসঙ্গত বোধ হইল, এবং

অমাত্যেরাও তাঁহার সহিত এক মত হইল। একদল মোগল্ সৈন্য সঙ্গে লইয়া রঘুপতি ও নক্ষত্ররায় ত্রিপুরাভি-মুখে যাত্রা করিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এই উপন্যাসের আরম্ভ কাল হইতে এখন দুই বৎসর হইয়া গিয়াছে। ধ্রুব তখন দুই বৎসরের বালক ছিল এখন তাহার বয়স চার বৎসর। এখন সে বিস্তর কথা শিখিয়াছে। এখন তিনি আপনাকে ভারি মস্তলোক জ্ঞান করেন। সকল কথা যদিও স্পষ্ট বলিতে পারেন না, কিন্তু অত্যন্ত জোরের সহিত বলিয়া থাকেন। রাজাকে প্রায় তিনি পুঁতুল দেব বলিয়া পরম প্রলোভন ও সান্ত্বনা দিয়া থাকেন, এবং রাজা যদি কোন প্রকার দুষ্টুমির লক্ষণ প্রকাশ করেন, তবে ধ্রুব তাঁকে "ঘরে বন্দ করে রাখ্‌ব" ব'লে অত্যন্ত শঙ্কিত করিয়া তুলেন। এইরূপে রাজা এখন বিশেষ শাসনে আছেন—ধ্রুবের অনভিমত কোন কাজ করিতে তিনি বড় একটা ভরসা করেন না।

ইতি মধ্যে হঠাৎ ধ্রুবের একটি সঙ্গী যুটিয়া গেল। একটি প্রতিবেশীর মেয়ে—ধ্রুব অপেক্ষা ছয়মাসের ছোট। মিনিট দশেকের ভিতরে উভয়ের মধ্যে চিরস্থায়ী ভাব হইয়া গেল। মাঝে একটুখানি মনান্তর হইবারও সম্ভাবনা হই-য়াছিল। ধ্রুবের হাতে একটা বড় বাতাসা ছিল। প্রথম

প্রণয়ের উচ্ছ্বাসে ধ্রুব তাহার দুইটি ছোট আঙ্গুল দিয়া অতি সাবধানে ক্ষুদ্র একটু কণা ভাঙ্গিয়া একেবারে তাহার সঙ্গিনীর মুখে পূরিয়া দিল ও পরম অনুগ্রহের সহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিল "তুমি কাও!" সঙ্গিনী মিষ্ট পাইয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়া কহিল "আরও কাব।" তখন ধ্রুব কিছু কাতর হইয়া পড়িল। বন্ধুত্বের উপরে এত অধিক দাবী ন্যায়সঙ্গত বোধ হইল না—ধ্রুব তাহার স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য্য ও গৌরবের সহিত ঘাড় নাড়িয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল "ছি—আর কেতে নেই—অছুখ কোবে, বাবা মা'বে!" বলিয়াই অধিক বিলম্ব না করিয়া সমস্ত বাতাসাটা নিজের মুখের মধ্যে একেবারে পূরিয়া দিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। সহসা বালিকার মুখের মাংস-পেশীর মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল—ওষ্ঠাধর ফুলিতে লাগিল, ভ্রূযুগ উপরে উঠিতে লাগিল—আসন্ন ক্রন্দনের সমস্ত লক্ষণ ব্যক্ত হইল। ধ্রুব কাহারও ক্রন্দন সহিতে পারিত না, তাড়াতাড়ি সুগম্ভীর সান্ত্বনার স্বরে কহিল "কাল দেবো।"

রাজা আসিবামাত্র ধ্রুব অত্যন্ত বিজ্ঞ হইয়া নূতন সঙ্গিনীর প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "এ'কে কিছু বোলো না, এ কাঁদ্‌বে! ছি, মার্‌তে নেই, ছি!" রাজার কোন প্রকার দুরভিসন্ধি ছিল না সত্য তথাপি গায়ে পড়িয়া রাজাকে সাবধান করিয়া দেওয়া ধ্রুব অত্যন্ত আবশ্যক বিবেচনা

করিল। বড়রা যেমন সহসা অত্যন্ত সাধুভাব ধারণ করিয়া ধ্রুবকে উপদেশ দিত ও দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত করিবার জন্য ভর্ৎসনা করিত, ধ্রুবও পৃথিবীর হিতার্থে সেই সকল উপদেশ ও ভর্ৎসনা সেইরূপ ভঙ্গীতে প্রত্যর্পণ করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিত। রাজা মেয়েটিকে মারিলেন না, ধ্রুব স্পষ্টই দেখিল তাহার উপদেশ নিষ্ফল নহে।

তার পরে ধ্রুব মুরুব্বির ভাব ধারণ করিয়া কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা নাই জানাইয়া মেয়েটিকে পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত আশ্বাস দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারও কিছু মাত্র আবশ্যক ছিল না। কারণ মেয়েটি আপনা হইতে নির্ভীক ভাবে রাজার কাছে গিয়া অত্যন্ত কৌতূহল ও লোভের সহিত তাঁহার হাতের কঙ্কন ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে ধ্রুব কেবলমাত্র নিজের যত্নে ও পরিশ্রমে পৃথিবীতে শান্তি ও প্রেম স্থাপন করিয়া প্রসন্ন চিত্তে রাজার মুখের কাছে আপনার বেলফুলের মত মোটা গোল কোমল পবিত্র মুখখানি বাড়াইয়া দিল—রাজার সদ্ব্যবহারের পুরস্কার—রাজা চুম্বন করিলেন। তখন ধ্রুব তাহার সঙ্গিনীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া রাজাকে অনুমতি ও অনুরোধের মাঝামাঝিস্বরে কহিল “এ’কে চুমো কাও!” রাজা ধ্রুবের আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহস করিলেন না। মেয়েটি তখন নিমন্ত্রণের কিছুমাত্র অপেক্ষা না রাখিয়া নিতান্ত অভ্যস্ত ভাবে অম্লান বদনে

রাজার কোলের উপরে চড়িয়া বসিল। এতক্ষণ জগতে কোন প্রকার অশান্তি বা উচ্ছৃঙ্খলতার লক্ষণ ছিল না, কিন্তু এইবার ধ্রুবের সিংহাসনে টান পড়িতেই তাহার সার্ব্বভৌমিক প্রেম টলমল করিয়া উঠিল। রাজার কোলের পরে তাহার নিজের একমাত্র স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা বলবতী হইয়া উঠিল। মুখ অত্যন্ত ভার হইল, মেয়েটিকে দুই একবার টানিল, এমন কি নিজের পক্ষে অবস্থা বিশেষে ছোট মেয়েকে মারাও ততটা অন্যায় বোধ হইল না! রাজা তখন মিট্‌মাট্‌ করিবার উদ্দেশে ধ্রুবকেও তাঁহার আধ-খানা কোলে টানিয়া লইলেন। কিন্তু তাহাতেও ধ্রুবের আপত্তি দূর হইল না। অপরার্দ্ধ অধিকার করিবার জন্য নূতন আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিল। এমন সময়ে নূতন রাজ পুরোহিত বিল্বন ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। রাজা উভয়কেই কোল হইতে নামাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ধ্রুবকে বলিলেন "ঠাকুরকে প্রণাম কর।" ধ্রুব তাহা আবশ্যক বোধ করিল না—মুখে আঙুল পুরিয়া বিদ্রোহী ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েটি আপনা হই-তেই রাজার দেখাদেখি পুরোহিতকে প্রণাম করিল।

বিল্বন ঠাকুর ধ্রুবকে কাছে টানিয়া লইয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার এ সঙ্গী জুটিল কোথা হইতে?"

ধ্রুব খানিকক্ষণ ভাবিয়া কহিল, "আমি টক্‌টক্‌ চ'ব!" টক্‌টক্‌ অর্থে ঘোড়া। চড়ব শব্দের মধ্যবর্ত্তী ড় লুপ্ত,

বঙ্গভাষার উপরে এরূপ যথেচ্ছ হস্তক্ষেপ করিতে ধ্রুব কুণ্ঠিত হইত না।

পুরোহিত কহিলেন—"বাহবা, প্রশ্ন এবং উত্তরের মধ্যে কি সামঞ্জস্য!"

সহসা মেয়েটির দিকে ধ্রুবের চক্ষু পড়িল, তাহার সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আপনার মত ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিল "ও দুষ্টু, ওকে মা'ব!" বলিয়া আকাশে আপনার ক্ষুদ্র মুষ্টি নিক্ষেপ করিল।

রাজা গম্ভীর ভাবে কহিলেন "ছি ধ্রুব।"

একটি ফুঁয়ে যেমন প্রদীপ নিবিয়া যায় তেমনি তৎক্ষণাৎ ধ্রুবের মুখ ম্লান হইয়া গেল। প্রথমে সে অশ্রু নিবারণের জন্য দুই মুষ্টি দিয়া দুই চক্ষু রগড়াইতে লাগিল—অবশেষে দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র স্ফীত হৃদয় আর ধারণ করিতে পারিল না কাঁদিয়া উঠিল। বিল্বন ঠাকুর তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া কোলে লইয়া আকাশে তুলিয়া ভূমিতে নামাইয়া অস্থির করিয়া তুলিলেন উচ্চৈস্বরে ও দ্রুত উচ্চারণে বলিলেন "শোন শোন ধ্রুব, শোন—তোমাকে শ্লোক বলি শোন—

কলহ কটকটাং কাঠ কাঠিন্য কাট্যং—
কটন কিটন কীটং কুট্মলং খট্টমট্টং—

অর্থাৎ কিনা যে ছেলে কাঁদে তাকে কলহ-কটকটাঙ্গের মধ্যে পুরে খুব করে কাঠ কাঠিন্য কাঠ্যং দিতে হয়, তার পরে

এতগুলো কটন কিটন কীটিং নিয়ে একেবারে তিন দিন ধ'রে কুট্টলং খট্টমট্টং—" পুরোহিত ঠাকুর এইরূপ অনর্গল বকিয়া গেলেন। ধ্রুবের ক্রন্দন অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল। সে প্রথমে গোলেমালে বিব্রত ও অবাক হইয়া বিল্বন ঠাকুরের মুখের দিকে সজল চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া রহিল। তার পরে তাঁর হাত মুখনাড়া দেখিয়া তাহার অত্যন্ত কৌতুক বোধ হইল। সে ভারি খুসি হইয়া বলিল "আবার বল।" পুরোহিত আবার বকিয়া গেলেন। ধ্রুব অত্যন্ত হাসিতে হাসিতে বলিল "আবার বল।" রাজা ধ্রুবের অশ্রুসিক্ত কপোলে এবং হাসি-ভরা অধরে বারবার চুম্বন করিলেন। তখন রাজা রাজপুরোহিত ও দুটি ছেলে মেয়ে মিলিয়া খেলা পড়িয়া গেল।

বিল্বন ঠাকুর রাজাকে কহিলেন—"মহারাজ ইহাদের লইয়া বেশ আছেন। দিনরাত প্রখর বুদ্ধিমানদের সঙ্গে থাকিলে বুদ্ধি লোপ পায়। ছুরিতে অবিশ্রাম শান পড়িলে ছুরি ক্রমেই সূক্ষ্ম হইয়া অন্তর্ধান করে। একটা মোটা বাঁট কেবল অবশিষ্ট থাকে!"

রাজা হাসিয়া কহিলেন "এখনো তবে বোধ করি আমার সূক্ষ্ম বুদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই।"

বিল্বন—"না। সূক্ষ্মবুদ্ধির একটা লক্ষণ এই যে তাহা সহজ জিনিষকে শক্ত করিয়া তুলে। পৃথিবীতে বিস্তর বুদ্ধিমান না থাকিলে পৃথিবীর কাজ অনেকটা সোজা হইত।

নানারূপ সুবিধা করিতে গিয়াই নানা রূপ অসুবিধা ঘটে। অধিক বুদ্ধি লইয়া মানুষ কি করিবে ভাবিয়া পায় না!”

রাজা কহিলেন—“পাঁচটা আঙ্গুলেই বেশ কাজ চলিয়া যায়—দুর্ভাগ্য ক্রমে সাতটা আঙ্গুল পাইলে ইচ্ছা করিয়া কাজ বাড়াইতে হয়।” রাজা ধ্রুবকে ডাকিলেন। ধ্রুব তাহার সঙ্গিনীর সহিত পুনরায় শান্তি স্থাপন করিয়া খেলা করিতেছিল। রাজার ডাক শুনিয়া তৎক্ষণাৎ খেলা ছাড়িয়া রাজার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে সম্মুখে বসাইয়া কহিলেন “ধ্রুব সেই নতুন গানটি ঠাকুরকে শোনাও।” কিন্তু ধ্রুব নিতান্ত আপত্তির ভাবে ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিল। রাজা লোভ দেখাইয়া বলিলেন—“তোমাকে টক্‌টক্ চড়তে দেব।” ধ্রুব তাহার আধ আধ উচ্চারণে বলিতে লাগিল—

(আমায়) ছ’জনায় মিলে পথ দেখায় বলে
পদে পদে পথ ভুলিহে।
নানা কথার ছলে নানান্ মুনি বলে
সংশয়ে তাই দুলি হে।
তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ
শত লোকের শত বুলি হে!

কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি
আড়াল ক'রে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধুলো তাই নিয়ে আছি
পাইনে চরণ-ধুলি হে!
শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়,
আপনা আপনি বিবাদ বাধায়,
কারে সামালিব এ কি হল দায়
একা যে অনেক গুলিহে!
আমায় এক কর তোমার প্রেমে বেঁধে,
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে—
ধাঁদার মাঝে পড়ে কত মরি কেঁদে
চরণেতে লহ তুলি হে!

ধ্রুবের মুখে আধ আধ স্বরে এই কবিতা শুনিয়া বিল্বন ঠাকুর নিতান্ত বিগলিত হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন "আশীর্ব্বাদ করি তুমি চিরজীবী হইয়া থাক।" ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইয়া ঠাকুর অনেক মিনতি করিয়া বলিলেন "আরেকবার শুনাও।"

ধ্রুব সুদৃঢ় মৌন আপত্তি প্রকাশ করিল। পুরোহিত চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া কহিলেন "তবে আমি কাঁদি!"

ধ্রুব ঈষৎ বিচলিত হইয়া কহিল—"কাল শোনাব। ছি কাঁদ্‌তে নেই। তুমি একন্ বায়ি (বাড়ি) যাও। বাবা মা'বে!"

বিল্বন হাসিয়া কহিলেন "মধুর গলাধাক্কা।" রাজার নিকটে বিদায় লইয়া পুরোহিত ঠাকুর পথে বাহির হইলেন।

পথে দুই জন পথিক যাইতেছিল। একজন আরেক জনকে কহিতেছিল "তিন দিন তার দরোজায় মাথা ভেঙ্গে মলুম এক পয়সা বের করতে পারলুম না—এইবার সে পথে বেরোলে তার মাথা ভাঙ্গবো দেখি তা'তে কি হয়।"

পিছন হইতে বিল্বন কহিলেন "তাতেও কোন ফল হবে না। দেখ্‌তেই ত পাচ্চ বাপু মাথার মধ্যে কিছুই থাকে না কেবল দুর্ব্বুদ্ধি আছে। বরঞ্চ নিজের মাথা ভাঙ্গা ভাল, কারো কাছে জবাবদিহি কর্‌তে হয় না।"

পথিকদ্বয় শশব্যস্ত ও অপ্রতিভ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিল। বিল্বন কহিলেন "বাপু তোমরা যে কথা বল্‌ছিলে, সে কথাগুলো ভাল নয়।"

পথিকদ্বয় কহিল "যে আজ্ঞে ঠাকুর, আর এমন কথা বল্‌ব না। "পুরোহিত ঠাকুরকে পথে ছেলেরা ঘিরিল। তিনি কহিলেন "আজ বিকেলে আমার ওখেনে যাস্ আমি আজ গল্প শোনাব।" আনন্দে ছেলেরা লাফালাফি চেঁচা মেচি বাধাইয়া দিল। বিল্বন ঠাকুর এক একদিন অপরাহ্লে রাজ্যের ছেলে জড় করিয়া তাহাদিগকে সহজ ভাষায় রামায়ণ মহাভারত ও পৌরাণিক গল্প শোনাইতেন। মাঝে মাঝে দুই একটা নীরস কথাও যথাসাধ্য রসসিক্ত করিয়া

বলিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু যখন দেখিতেন ছেলেদের মধ্যে হাই তোলা সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে—তখন তাহাদের মন্দিরের বাগানে ছাড়িয়া দিতেন। সেখানে ফলের গাছ অসংখ্য আছে। ছেলে গুলো আকাশভেদী চীৎকার শব্দে বানরের মত ডালে ডালে লুটপাট বাধাইয়া দিত—বিল্বন আমোদ দেখিতেন।

বিল্বন সন্ন্যাসী পরমহংস। তিনি কোন্ দেশী লোক কেহ জানে না। ব্রাহ্মণ, কিন্তু উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন। বলিদান প্রভৃতি বন্ধ করিয়া এক প্রকার নূতন অনুষ্ঠানে কালীর পূজা করিয়া থাকেন—প্রথম প্রথম তাহাতে লোকেরা সন্দেহ ও আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু এখন সমস্ত সহিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ বিল্বনের কথায় সকলে বশ। বিল্বন সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়া সকলের সঙ্গে আলাপ করেন, সকলের সংবাদ লন, এবং রোগীকে যাহা ঔষধ দেন তাহা আশ্চর্য্য খাটিয়া যায়। বিপদে আপদে সকলেই তাঁহার পরামর্শমতে কাজ করে—তিনি মধ্যবর্ত্তী হইয়া কাহারো বিবাদ মিটাইয়া দিলে বা কিছুর মীমাংসা করিয়া দিলে তাহার উপরে আর কেহ কথা কহে না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এই বৎসরে ত্রিপুরায় এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। উত্তর হইতে সহসা পালে পালে ইঁদুর ত্রিপুরার শস্যক্ষেত্রে

আসিয়া পড়িল। শস্য সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিল, এমন কি, কৃষকের ঘরে শস্য যত কিছু সঞ্চিত ছিল তাহাও অধিকাংশ খাইয়া ফেলিল—রাজ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। বন হইতে ফল মূল আহরণ করিয়া লোকে প্রাণ ধারণ করিতে লাগিল। বনের অভাব নাই, এবং বনে নানা প্রকার আহার্য্য উদ্ভিজ্জও আছে। মৃগয়ালব্ধ মাংস বাজারে মহার্ঘ্য মূল্যে বিক্রয় হইতে লাগিল। লোকে বুনো মহিষ, হরিণ, খরগোষ, সজারু কাঠবিড়ালি, বরা, বড় বড় স্থলকচ্ছপ শিকার করিয়া খাইতে লাগিল—হাতি পাইলে হাতিও খায়—অজগর সাপ খাইতে লাগিল—বনে আহার্য্য পাখীর অভাব নাই—গাছের কোটরের মধ্যে মৌচাক ও মধু পাওয়া যায়—স্থানে স্থানে নদীর জল বাঁধিয়া তাহাতে মাদক লতা ফেলিয়া দিলে মাছেরা অবশ হইয়া ভাসিয়া উঠে, সেই সকল মাছ ধরিয়া লোকেরা খাইতে লাগিল এবং শুকাইয়া সঞ্চয় করিল। বিল্বন ঠাকুর কুটীরে কুটীরে ভ্রমণ করিয়া সকলকে অভয় দিতে লাগিলেন, এবং আহার্য্য সংগ্রহের নানা উপায় বলিয়া দিতে লাগিলেন—তিনি দেখাইয়া দিলেন বনে একপ্রকার গুল্ম পাওয়া যায় তাহার ছোট ছোট বীজ সিদ্ধ করিলে দুধের মত শ্বেত পদার্থ বাহির হয়, তাহা অল্প পরিমাণে খাইলেই অতি শীঘ্র ক্ষুধা নিবারণ হইয়া যায়। আহার এখনো কোন ক্রমে চলিয়া

যাইতেছে বটে কিন্তু অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। স্থানে স্থানে চুরী ডাকাতী আরম্ভ হইল। প্রজারা বিদ্রো-হের লক্ষণ প্রকাশ করিল। তাহারা বলিতে লাগিল, মায়ের বলি বন্ধ করাতে মায়ের অভিশাপে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিল্বন ঠাকুর সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি উপহাসচ্ছলে কহিলেন— কৈলাসে কার্ত্তিক গণেশের মধ্যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, কার্ত্তিকের ময়ূর গণেশের ইঁদুরদের তাড়া করিয়াছে, তাই ইঁদুরগুলো ত্রিপুরার ত্রিপুরেশ্বরীর কাছে নালিষ করিতে আসিয়াছে। প্রজারা এ কথা নিতান্ত উপহাসের ভাবে গ্রহণ কবিল না। তাহারা দেখিল বিল্বন ঠাকুরের কথামত ইঁদুরের স্রোত যেমন দ্রুতবেগে আসিল তেমনি দ্রুতবেগে সমস্ত শস্য নষ্ট করিয়া কোথায় অন্তর্ধান করিল—তিন দিনের মধ্যে তাহাদের আর চিহ্নমাত্র রহিল না। বিল্বন ঠাকুরের অগাধ জ্ঞানের সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ রহিল না। কৈলাসে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ সম্বন্ধে গান রচিত হইতে লাগিল—মেয়েরা ছেলেরা ভিক্ষুকেরা সেই গান গাহিতে লাগিল, পথে ঘাটে সেই গান প্রচলিত হইল। কিন্তু রাজার প্রতি বিদ্বেষভাব ভাল করিয়া ঘুচিল না। বিল্বন ঠাকুরের পরামর্শ মতে গোবিন্দমাণিক্য দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজা-দের এক বৎসরের খাজনা মাপ করিলেন। তাহার কতকটা ফল হইল। কিন্তু তবুও অনেকে মায়ের অভি-

শাপ এড়াইবার জন্য চট্টগ্রামে পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করিতে লাগিল। এমন কি রাজার মনে সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল। তিনি বিল্বনকে ডাকিয়া কহিলেন "ঠাকুর, রাজার পাপেই প্রজা কষ্ট পায়। আমি কি মায়ের বলি বন্ধ করিয়া পাপ করিযাছি? তাহারই কি এই শাস্তি?"

বিল্বন সমস্ত কথা একেবারে উড়াইয়া দিলেন। তিনি কহিলেন "মায়ের কাছে যখন হাজার নরবলি হইত তখন আপনার অধিক প্রজাহানি হইয়াছে, না এই দুর্ভিক্ষে অধিক হইয়াছে?"

রাজা নিরুত্তর হইয়া রহিলেন কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে হইতে সংশয় সম্পূর্ণ দূর হইল না। প্রজারা তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছে তাঁহার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে, ইহাতে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে, তাঁহার নিজের প্রতিও নিজের সন্দেহ জন্মিয়াছে। তিনি নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন "কিছুই বুঝিতে পারি না।"

বিল্বন কহিলেন "অধিক বুঝিবার আবশ্যক কি? কেন কতকগুলো ইঁদুর আসিয়া শস্য খাইয়া গেল তাহা নাই বুঝিলাম! আমি অন্যায় করিব না, আমি সকলের হিত করিব, এইটুকু স্পষ্ট বুঝিলেই হইল। তার পরে বিধাতার কাজ বিধাতা করিবেন, তিনি আমাদের হিসাব দিতে আসিবেন না।"

রাজা কহিলেন "ঠাকুর তুমি গৃহে গৃহে ফিরিয়া অবি-

শ্রাম কাজ করিতেছ—পৃথিবীর যতটুকু হিত করিতেছ ততটুকুই তোমার পুরস্কার হইতেছে; এই আনন্দে তোমার সমস্ত সংশয় চলিয়া যায়। আমি কেবল দিনরাত্রি একটা মুকুট মাথায় করিয়া সিংহাসনের উপরে চড়িয়া বসিয়া আছি—কেবল কতকগুলো চিন্তা ঘাড়ে করিয়া আছি, তোমার কাজ দেখিলে আমার লোভ হয়।"

বিল্বন কহিলেন "মহারাজ, আমি তোমারইত এক অংশ; তুমি ঐ সিংহাসনে চড়িয়া না থাকিলে আমি কি কাজ করিতে পারিতাম! তোমাতে আমাতে মিলিয়া আমরা উভয়ে সম্পূর্ণ হইয়াছি!"

এই বলিয়া বিল্বন বিদায় গ্রহণ করিলেন—রাজা মুকুট মাথায় করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। মনে মনে কহিলেন "আমার কাজ যথেষ্ট রহিয়াছে, আমি তাহার কিছুই করি না। আমি কেবল আমার চিন্তা লইয়াই নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। সেই জন্যই আমি প্রজাদের বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারি না। রাজ্যশাসনের আমি যোগ্য নই।"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মোগল সৈন্যের কর্তা হইয়া নক্ষত্ররায় পথের মধ্যে তেঁতুলে নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রভাতে রঘুপতি আসিয়া কহিলেন "যাত্রা করিতে হইবে, মহারাজ প্রস্তুত হোন্।"

সহসা রঘুপতির মুখে মহারাজ শব্দ অত্যন্ত মিষ্ট শুনাইল। নক্ষত্ররায় উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। তিনি কল্পনায় পৃথিবী-সুদ্ধ লোকের মুখ হইতে মহারাজ সম্ভাষণ শুনিতে লাগিলেন—তিনি মনে মনে ত্রিপুরার উচ্চ সিংহাসনে চড়িয়া সভা উজ্জ্বল করিয়া বসিলেন। মনের আনন্দে বলিলেন—"ঠাকুর আপনাকে কখনই ছাড়া হইবে না। আপনাকে সভায় থাকিতে হইবে। আপনি কি চান্ সেইটে আমাকে বলুন!" নক্ষত্ররায় মনে মনে রঘুপতিকে তৎক্ষণাৎ বৃহৎ একখণ্ড জায়গীর অবলীলাক্রমে দান করিয়া ফেলিলেন।

রঘুপতি কহিলেন "আমি কিছু চাহি না।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "সে কি কথা! তা হইবে না ঠাকুর। কিছু লইতেই হইবে। কয়লাসর পরগনা আমি আপনাকে দিলাম—আপনি লেখাপড়া করিয়া লউন।"

রঘুপতি কহিলেন "সে সকল পরে দেখা যাইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "পরে কেন, আমি এখনি দিব। সমস্ত কয়লাসর পরগনা আপনারই হইল; আমি এক পয়সা খাজনা লইব না।" বলিয়া নক্ষত্ররায় মাথা তুলিয়া অত্যন্ত সীধা হইয়া বসিলেন।

রঘুপতি কহিলেন—"মরিবার জন্য তিন হাত জমি মিলিলেই আমি সুখী হইব। আমি আর কিছু চাহি না।" বলিয়া রঘুপতি চলিয়া গেলেন। তাঁহার জয়সিংহকে মনে পড়িয়াছে। জয়সিংহ যদি থাকিত তবে পুরস্কারের স্বরূপ

কিছু লইতেন—জয়সিংহ যখন নাই তখন সমস্ত ত্রিপুরা-রাজ্য মৃত্তিকার সমষ্টি ছাড়া আর কিছু মনে হইল না।

রঘুপতি এখন নক্ষত্ররায়কে রাজাভিমানে মত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার মনের মধ্যে ভয় আছে পাছে এত আয়োজন করিয়া সমস্ত ব্যর্থ হয়; পাছে দুর্ব্বল-স্বভাব নক্ষত্র রায় ত্রিপুরায় গিয়া বিনাযুদ্ধে রাজার নিকট ধরা দেন। কিন্তু দুর্ব্বল হৃদয়ে একবার রাজ্যমদ জন্মিলে আর ভাবনা নাই। রঘুপতি নক্ষত্ররায়ের প্রতি আর অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না, কথায় কথায় তাঁহার সম্মান দেখাইয়া থাকেন। সকল বিষয়ে তাঁহার মৌখিক আদেশ লইয়া থাকেন। মোগল সৈন্যেরা তাঁহাকে মহারাজা সাহেব বলে, তাঁহাকে দেখিলে শশব্যস্ত হইয়া উঠে—বায়ু বহিলে যেমন সমস্ত শস্যক্ষেত্র নত হইয়া যায় তেমনি নক্ষত্ররায় আসিয়া দাড়াইলে সারি সারি মোগল সেনা এক সঙ্গে মাথা নত করিয়া সেলাম করে। সেনাপতি সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করেন। শত শত মুক্ত তরবারীর জ্যোতির মধ্যে বৃহৎ হস্তীর পৃষ্ঠে রাজচিহ্ন অঙ্কিত স্বর্ণমণ্ডিত হাওদায় চড়িয়া তিনি যাত্রা করেন, সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসজনক বাদ্য বাজিতে থাকে—সঙ্গে সঙ্গে নিশানধারী রাজনিশান ধরিয়া চলে। তিনি যেখান দিয়া যান, সেখানকার গ্রামের লোক সৈন্যের ভয়ে ঘর বাড়ি ছাড়িয়া পালাইয়া যায়। তাহাদের ত্রাস দেখিয়া নক্ষত্ররায়ের মনে গর্ব্বের উদয় হয়। তাঁহার মনে

হয় আমি দিগ্বিজয় করিয়া চলিয়াছি। ছোট ছোট জমিদার-গণ নানাবিধ উপঢৌকন লইয়া আসিয়া তাঁহাকে সেলাম করিয়া যায়—তাহাদিগকে পরাজিত নৃপতি বলিয়া বোধ হয়—মহাভারতের দিগ্বিজয়ী পাণ্ডবদের কথা মনে পড়ে।

এক দিন সৈন্যেরা আসিয়া সেলাম করিয়া কহিল "মহা-রাজ সাহেব!" নক্ষত্রবায় খাড়া হইয়া বসিলেন। "আমরা মহারাজের জন্য জান্ দিতে আসিয়াছি—আমরা জানের পরোয়া রাখিনা। বরাবর আমাদের দস্তুর আছে—লড়াইয়ে যাইবার পথে আমরা গ্রাম লুঠ করিয়া যাই—কোন শাস্ত্রে ইহাতে দোষ লিখে না।"

নক্ষত্ররায় মাথা নাড়িয়া কহিলেন "ঠিক কথা, ঠিক কথা!"

সৈন্যেরা কহিল "ব্রাহ্মণ-ঠাকুর আমাদের লুঠ করিতে বারণ করিয়াছেন। আমরা জান্ দিতে যাইতেছি অথচ একটু লুঠ করিতে পারিবনা এ বড় অবিচার!"

নক্ষত্ররায় পুনশ্চ মাথা নাড়িয়া কহিলেন "ঠিক কথা, ঠিক কথা।"

"মহারাজার যদি হুকুম মিলেত আমরা ব্রাহ্মণ ঠাকুরের কথা না মানিয়া লুঠ করিতে যাই।"

নক্ষত্ররায় অত্যন্ত স্পর্দ্ধার সহিত কহিলেন "ব্রাহ্মণ ঠাকুর কে? ব্রাহ্মণ ঠাকুর কি জানে! আমি তোমাদিগকে হুকুম দিতেছি তোমরা লুঠপাঠ করিতে যাও।" বলিয়া একবা

ইতস্তত চাহিয়া দেখিলেন—কোথাও রঘুপতিকে দেখিতে না পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু রঘুপতিকে এইরূপে অকাতরে লঙ্ঘন করিয়া তিনি মনের মধ্যে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। ক্ষমতামদ মদিরার মত তাঁহার শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইতে লাগিল। পৃথিবীকে নূতন চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। কাল্পনিক বেলুনের উপরে চড়িয়া পৃথিবীটা যেন অনেক নিম্নে মেঘের মত মিলাইয়া গেল। এমন কি, মাঝে মাঝে কদাচ কখনো রঘুপতিকেও কিছুই-না বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সহসা বলপূর্ব্বক গোবিন্দ মাণিক্যের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। মনে মনে বার বার করিয়া বলিতে লাগিলেন "আমাকে নির্ব্বাসন! একটা সামান্য প্রজার মত আমাকে বিচার সভায় আহ্বান! এবার দেখি কে কাহাকে নির্ব্বাসিত করে! এবার ত্রিপুরা-সুদ্ধ লোক নক্ষত্ররায়ের প্রতাপ অবগত হইবে!" নক্ষত্ররায় ভাবি উৎফুল্ল ও স্ফীত হইলেন। নিরীহ গ্রাম-বাসীদের প্রতি অনর্থক উৎপীড়ন ও লুঠপাটের প্রতি রঘুপতির বিশেষ বিরাগ ছিল। নিবারণ করিবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সৈন্যেরা নক্ষত্র-রায়ের আজ্ঞা পাইয়া তাঁহাকে অবহেলা করিল। তিনি নক্ষত্ররায়ের কাছে আসিয়া বলিলেন "অসহায় গ্রামবাসী-দের উপরে কেন এ অত্যাচার!"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "ঠাকুর এসব বিষয়ে তুমি ভাল

বোঝ না। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় সৈন্যদের লুঠপাটে নিষেধ করিয়া নিরুৎসাহ করা ভাল না।"

নক্ষত্ররায়ের কথা শুনিয়া রঘুপতি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। সহসা নক্ষত্ররায়ের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান দেখিয়া তিনি মনে মনে হাসিলেন। কহিলেন "এখন লুঠপাট করিতে দিলে পরে ইহাদিগকে সামলান দায় হইবে। সমস্ত ত্রিপুরা লুটিয়া লইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "তাহাতে হানি কি? আমি ত তাহাই চাই। ত্রিপুরা একবার বুঝুক্ নক্ষত্ররায়কে নির্ব্বাসিত করার ফল কি। ঠাকুর এ সব বিষয়ে তুমি কিছু বুঝ না—তুমি ত কখন যুদ্ধ কর নাই!"

রঘুপতি মনে মনে অত্যন্ত আমোদ বোধ করিলেন। কিছু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেলেন। নক্ষত্ররায় নিতান্ত পুত্তলিকার মত না হইয়া একটু শক্ত মানুষের মত হন, এই তাঁহার ইচ্ছা ছিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ত্রিপুরায় ইন্দুরের উৎপাৎ যখন আরম্ভ হয় তখন শ্রাবণ মাস। তখন ক্ষেত্রে কেবল ভুট্টা ফলিয়াছিল এবং পাহাড়ে জমিতে ধান্য-ক্ষেত্রেও পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তিন মাস কোন মতে কাটিয়া গেল—অগ্রহায়ণ মাসে নিম্নভূমিতে যখন ধান কাটিবার সময় আসিল তখন দেশে

আনন্দ পড়িয়া গেল। চাষারা * স্ত্রীলোক বালক যুবক বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া দা হাতে লইয়া ক্ষেত্রে গিয়া পড়িল। হৈয়া হৈয়া শব্দে পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতে লাগিল—জুমিয়া রমণীদের গানে মাঠ বাট ধ্বনিত হইয়া উঠিল। রাজার প্রতি অসন্তোষ দূর হইয়া গেল—রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। এমন সময়ে সংবাদ আসিল, নক্ষত্র-রায় রাজ্য আক্রমণের উদ্দেশে বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন—এবং অত্যন্ত লুটপাট উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এই সংবাদে সমস্ত রাজ্য সশঙ্কিত হইয়া উঠিল।

এ সংবাদ রাজার বক্ষে ছুরীর মত বিদ্ধ হইল। সমস্ত দিনই তাঁহাকে বিঁধিতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া কেবলি প্রত্যেকবার নূতন করিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল নক্ষত্ররায় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে! নক্ষত্র-রায়ের সরল সুন্দর মুখ শতবার তাঁহার স্নেহ চক্ষের সম্মুখে দেখিতে লাগিলেন এবং সেই সঙ্গেই মনে হইতে লাগিল সেই নক্ষত্ররায় কতকগুলো সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তলোয়ার হাতে লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসি-

* প্রকৃত পক্ষে ইহাদের চাষা বলা যায় না—কারণ ইহারা রীতিমত চাষ করে না। জঙ্গল দগ্ধ করিয়া বর্ষা-রম্ভে বীজ বপন করে মাত্র। এইরূপ ক্ষেত্রকে জুম বলে—কৃষকদিগকে জুমিয়া বলে।

তেছে। এক একবার তাঁহার মনে মনে ইচ্ছা করিতে লাগিল—একটি সৈন্যও না লইয়া নক্ষত্ররায়ের সম্মুখে বৃহৎ রণক্ষেত্রে একা দাঁড়াইয়া সমস্ত বক্ষস্থল অবারিত করিয়া নক্ষত্ররায়ের সহস্র সৈনিকের তরবারি এককালে তাঁহার হৃদয়ে গ্রহণ করেন। তিনি ধ্রুবকে কাছে টানিয়া বলিলেন "ধ্রুব, তুইও কি এই মুকুটখানার জন্য আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে পারিস?" বলিয়া মুকুট ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন, একটি বড় মুক্তা ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল।

ধ্রুব আগ্রহের সহিত হাত বাড়াইয়া কহিল "আমি নেব।"

রাজা ধ্রুবের মাথায় মুকুট পরাইয়া তাহাকে কোলে লইয়া কহিলেন "এই লও—আমি কাহারও সহিত ঝগড়া করিতে চাই না।" বলিয়া অত্যন্ত আবেগের সহিত ধ্রুবকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাহার পরে সমস্ত দিন ধরিয়া "এ কেবল আমারই পাপের শাস্তি" বলিয়া রাজা নিজের সহিত তর্ক করিতে লাগিলেন। নহিলে ভাই কখনো ভাইকে আক্রমণ করে না। ইহা মনে করিয়া তাঁহার কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা হইল। তিনি মনে করিলেন ইহা ঈশ্বরের বিধান। জগৎপতির দরবার হইতে আদেশ আসিয়াছে, ক্ষুদ্র নক্ষত্ররায় কেবল তাহার মানব হৃদয়ের প্ররোচনায় তাহা লঙ্ঘন করিতে পারে না। এই মনে করিয়া তাঁহার আহত স্নেহ কিছু শান্তি পাইল। পাপ তিনি নিজের স্কন্ধে

লইতে রাজি আছেন—নক্ষত্ররায়ের পাপের ভার তাহাতে কতকটা কমিয়া যায়।

বিল্বন আসিয়া কহিলেন "মহারাজ, এ সময় কি আকাশের দিকে তাকাইয়া ভাবিবার সময়?"

রাজা কহিলেন "ঠাকুর, এ সকল আমারই পাপের ফল!"

বিল্বন কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন "মহারাজ, এই সকল কথা শুনিলে আমার ধৈর্য্য থাকে না। দুঃখ যে পাপেরই ফল তাহা কে বলিল, পুণ্যের ফলও হইতে পারে। কত ধর্ম্মাত্মা আজীবন দুঃখে কাটাইয়া গিয়াছেন। সুখ পুণ্যের ফল নহে, পুণ্যই পুণ্যের ফল।"

রাজা নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

বিল্বন জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ কি পাপ করিয়াছিলেন যাহার ফলে এই ঘটনা ঘটিল!"

রাজা কহিলেন "আমি আপন ভাইকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলাম।"

বিল্বন কহিলেন "আপনি ভাইকে নির্ব্বাসিত করেন নাই। দোষীকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন।"

রাজা কহিলেন "দোষী হইলেও তথাপি ভাইকে নির্ব্বাসনের পাপ আছেই। তাহার ফল হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। কৌরবেরা দুরাচারী হইলেও পাণ্ডবেরা তাঁহাদিগকে বধ করিয়া প্রসন্নচিত্তে রাজ্যসুখভোগ করিতে

পারিলেন না। যজ্ঞ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। পাণ্ডবেরা কৌরবদের নিকট হইতে রাজ্য লইলেন, কৌরবেরা মরিয়া গিয়া পাণ্ডবদের রাজ্য হরণ করিলেন। আমি নক্ষত্রকে নির্ব্বাসিত কবিয়াছি নক্ষত্র আমাকে নির্ব্বাসিত করিতে আসিতেছে।”

বিল্বন কহিলেন—“পাণ্ডবেবা পাপের শাস্তি দিবার জন্য কৌরবদের সহিত যুদ্ধ করেন নাই, তাঁহারা রাজ্যলাভের জন্য করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ পাপেব শাস্তি দিয়া নিজের সুখ দুঃখ উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন। ইহাতে আমিত পাপ কিছুই দেখিতেছি না। তবে প্রায়শ্চিত্তের বিধি দিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আমি ব্রাহ্মণ উপস্থিত আছি, আমাকে সন্তুষ্ট করিলেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে।”

রাজা ঈষৎ হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। বিল্বন কহিলেন “সে যাহাই হৌক্—এখন যুদ্ধের আয়োজন করুন। আর বিলম্ব করিবেন না।”

রাজা কহিলেন—আমি যুদ্ধ করিব না।”

বিল্বন কহিলেন “সে হইতেই পাবে না। আপনি বসিয়া বসিয়া ভাবুন। আমি ততক্ষণ সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করিগে। সকলেই এখন জুমে গিয়াছে, যথেষ্ট সৈন্য পাওয়া কঠিন।”

বলিয়া আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বিল্বন

চলিয়া গেলেন। ধ্রুবের সহসা কি মনে হইল; সে রাজার কাছে আসিয়া রাজার মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কাকা কোথায়!" নক্ষত্ররায়কে ধ্রুব কাকা বলিত।

রাজা কহিলেন "কাকা আসিতেছেন ধ্রুব।" তাঁহার চোখের পাতা ঈষৎ আর্দ্র হইয়া গেল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিল্বন ঠাকুরের বিস্তর কাজ পড়িয়া গেল। তিনি চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে নানা উপহার সমেত দ্রুতগামী দূত পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে কুকী গ্রামপতিদের নিকটে কুকী সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। যুদ্ধের নাম শুনিয়া তাহারা নাচিয়া উঠিল। কুকীদের যত লাল (গ্রামপতি) ছিল তাহারা যুদ্ধের সংবাদ স্বরূপ লাল বস্ত্র খণ্ডে বাঁধা দা দূত হস্তে গ্রামে গ্রামে পাঠাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে কুকির স্রোত চট্টগ্রামের শৈল শৃঙ্গ হইতে ত্রিপুরার শৈল-শৃঙ্গে আসিয়া পড়িল। তাহাদিগকে কোন নিয়মের মধ্যে সংযত করিয়া রাখাই দায়। বিল্বন স্বয়ং ত্রিপুরার গ্রামে গ্রামে গিয়া জুম হইতে বাছিয়া বাছিয়া সাহসী যুবা পুরুষ-দিগকে সৈন্য শ্রেণীতে সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। অগ্রসর হইয়া মোগল সৈন্যদিগকে আক্রমণ করা বিল্বন ঠাকুর সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। যখন তাহারা সমতলক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্গম শৈলশৃঙ্গে আসিয়া

উপস্থিত হইবে, তখন অরণ্য, পর্ব্বত ও নানা দুর্গম গুপ্ত স্থান হইতে তাহাদিগকে সহসা আক্রমণ করিয়া চকিত করিবেন স্থির করিলেন। বড় বড় শিলাখণ্ডের দ্বারা গোমতী নদীর জল বাঁধিয়া রাখিলেন—নিতান্ত পরাভবের আশঙ্কা দেখিলে সেই বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া জলপ্লাবনের দ্বারা মোগল সৈন্যদিগকে ভাসাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

এদিকে নক্ষত্ররায় দেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে ত্রিপুরার পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন জুম কাটা শেষ হইয়া গেছে। জুমিয়ারা সকলেই দা ও তীরধনু হাতে করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। কুকীদলকে উচ্ছ্বসোন্মুখ জলপ্রপাতের মত আর বাঁধিয়া রাখা যায় না।

গোবিন্দমাণিক্য বলিলেন "আমি যুদ্ধ করিব না।"

বিল্বন ঠাকুর কহিলেন "এ কোন কাজের কথাই নহে।"

রাজা কহিলেন "আমি রাজত্ব করিবার যোগ্য নহি তাহারই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। সেই জন্য আমার প্রতি প্রজাদের বিশ্বাস নাই, সেই জন্যই দুর্ভিক্ষের সূচনা, সেই জন্যই এই যুদ্ধ। রাজ্য পরিত্যাগের জন্য এ সকল ভগবানের আদেশ।"

বিল্বন কহিলেন "এ কখনই ভগবানের আদেশ নহে। ঈশ্বর তোমার উপরে রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছেন; যত দিন রাজকার্য্য নিঃশঙ্কট ছিল ততদিন তোমার সহজ কর্ত্তব্য অনায়াসে পালন করিয়াছ, যখনি রাজ্যভার গুরু-

তর হইয়া উঠিয়াছে তখনই তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া তুমি স্বাধীন হইতে চাহিতেছ--এবং ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া আপনাকে ফাঁকি দিয়া সুখী করিতে চাহিতেছ।”

কথাটা গোবিন্দমাণিক্যের মনে লাগিল। তিনি নিরুত্তর হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। অবশেষে নিতান্ত কাতর হইয়া বলিলেন “মনে কর না ঠাকুর আমার পরাজয় হইয়াছে, নক্ষত্র আমাকে বধ করিয়া রাজা হইয়াছে।”

বিল্বন কহিলেন “যদি সত্য তাহাই ঘটে তাহা হইলে আমি মহারাজের জন্য শোক করিব না। কিন্তু মহারাজ যদি কর্ত্তব্যে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন, তবেই আমাদের শোকের কারণ ঘটিবে।”

রাজা কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া কহিলেন “আপনার ভাইয়ের রক্তপাত করিব!”

বিল্বন কহিলেন “কর্ত্তব্যের কাছে ভাইবন্ধু কেহই নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কি উপদেশ দিয়াছিলেন স্মরণ করিয়া দেখুন।”

রাজা কহিলেন ‘ঠাকুর, তুমি কি বল আমি স্বহস্তে এই তরবারী লইয়া নক্ষত্ররায়কে আঘাত করিব!”

বিল্বন কহিলেন “হাঁ।”

সহসা ধ্রুব আসিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে কহিল “ছি, ও কথা বল্‌তে নেই!” ধ্রুব খেলা করিতেছিল, দুই পক্ষের কি একটা গোলমাল শুনিয়া সহসা তাহার মনে হইল

দুই জনে অবশ্যই একটা দুষ্টামি করিতেছে, অতএব সময় থাকিতে দুই জনকে কিঞ্চিৎ শাসন করিয়া আসা আবশ্যক এই সকল বিবেচনা করিয়া তিনি হঠাৎ আসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন "ছি ও কথা বলতে নেই।" পুরোহিত ঠাকুরের অত্যন্ত আমোদ বোধ হইল; তিনি হাসিয়া উঠিলেন; ধ্রুবকে কোলে লইয়া চুমো খাইতে লাগিলেন। কিন্তু রাজা হাসিলেন না। তাঁহার মনে হইল যেন বালকের মুখে তিনি দৈববাণী শুনিলেন। তিনি অসন্দিগ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন "ঠাকুর, আমি স্থির করিয়াছি, এ রক্তপাত আমি ঘটিতে দিব না, আমি যুদ্ধ করিব না।"

বিল্বন ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন "মহারাজের যদি যুদ্ধ করিতেই আপত্তি থাকে তবে আর এক কাজ করুন। আপনি নক্ষত্ররায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে বিরত করুন।"

গোবিন্দ মাণিক্য কহিলেন "ইহাতে আমি সম্মত আছি।"

বিল্বন কহিলেন "তবে সেইরূপ প্রস্তাব লিখিয়া নক্ষত্র-রায়ের নিকট পাঠান হউক্!" অবশেষে তাহাই স্থির হইল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নক্ষত্ররায় সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কোথাও তিল মাত্র বাধা পাইলেন না। ত্রিপুরার সে

গ্রামেই তিনি পদার্পণ করিলেন, সেই গ্রামই তাঁহাকে রাজা বলিয়া বরণ করিতে লাগিল। পদে পদে রাজত্বের আস্বাদ পাইতে লাগিলেন—ক্ষুধা আরও বাড়িতে লাগিল—চারি দিকের বিস্তৃত ক্ষেত্র, গ্রাম, পর্ব্বত শ্রেণী, নদী সমস্তই আমার বলিয়া মনে হইতে লাগিল, এবং সেই অধিকার-ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নিজেও যেন অনেকদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া অত্যন্ত প্রশস্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। মোগল সৈন্যেরা যাহা চায় তিনি তাহাই তাহাদিগকে লইতে আলী হুকুম দিয়া দিলেন। মনে হইল এ সমস্তই আমার এবং ইহারা আমারই রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাদিগকে কোন সুখ হইতে বঞ্চিত করা হইবে না—স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া মোগলেরা তাঁহার আতিথ্যের ও রাজবৎ উদারতা ও বদান্যতার অনেক প্রশংসা করিবে—বলিবে "ত্রিপুরার রাজা বড় কম রাজা নহে।" মোগল সৈন্যদের নিকট হইতে খ্যাতি লাভ করিবার জন্য তিনি সততই উৎসুক হইয়া রহিলেন। তাহারা তাঁহাকে কোন প্রকার শ্রুতি-মধুর সম্ভাষণ করিলে তিনি নিতান্ত জল হইয়া যান। সর্ব্বদাই ভয় হয় পাছে কোন নিন্দার কারণ ঘটে।

রঘুপতি আসিয়া কহিলেন "মহারাজ, যুদ্ধের ত কোন উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "না ঠাকুর, ভয় পাইয়াছে।" বলিয়া অত্যন্ত হাসিতে লাগিলেন।

রঘুপতি হাসিবার বিশেষ কোন কারণ দেখিলেন না, কিন্তু তথাপিও হাসিলেন।

নক্ষত্ররায় কহিলেন "নক্ষত্ররায় নবাবের সৈন্য লইয়া আসিয়াছে। বড় সহজ ব্যাপার নহে!"

রঘুপতি কহিলেন "দেখি এবার কে কাহাকে নির্ব্বাসনে পাঠায়! কেমন?"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "আমি ইচ্ছা করিলে নির্ব্বাসন দণ্ড দিতে পারি, কারারুদ্ধ করিতেও পারি—বধের হুকুম দিতেও পারি! এখনও স্থির করি নাই কোন্‌টা করিব।" বলিয়া অতিশয় বিজ্ঞভাবে অনেক বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

রঘুপতি কহিলেন—"অত ভাবিবেন না মহারাজ! এখনও অনেক সময় আছে। কিন্তু আমার ভয় হইতেছে, গোবিন্দমাণিক্য যুদ্ধ না করিয়াই আপনাকে পরাভূত করিবেন।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "সে কেমন করিয়া হইবে!"

রঘুপতি কহিলেন "গোবিন্দমাণিক্য সৈন্যগুলোকে আড়ালে রাখিয়া বিস্তর ভ্রাতৃস্নেহ দেখাইবেন। গলা ধরিয়া বলিবেন—ছোট ভাই আমার, এস ঘরে এস, দুধসর খাও-সে। মহারাজ কাঁদিয়া বলিবেন—যে আজ্ঞে আমি এখনি যাইতেছি। অধিক বিলম্ব হইবে না।—বলিয়া নাগরা জুতা যোড়াটা পায়ে দিয়া দাদার পিছনে পিছনে মাথা

নীচু করিয়া টাট্টু ঘোড়াটির মত চলিবেন। বাদশাহের মোগল ফৌজ তামাসা দেখিয়া হাসিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইবে।”

নক্ষত্ররায় রঘুপতির মুখে এই তীব্র বিদ্রূপ শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। কিঞ্চিৎ হাসিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া বলিলেন “আমাকে কি ছেলে মানুষ পাইয়াছে যে এম্‌নি করিয়া ভুলাইবে! তাহার যো নাই। সে হবে না ঠাকুর! দেখিয়া লইও!”

সেই দিন গোবিন্দমাণিক্যের চিঠি আসিয়া পৌঁছিল। সে চিঠি রঘুপতি খুলিলেন। রাজা অত্যন্ত স্নেহ প্রকাশ করিয়া সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছেন। চিঠি নক্ষত্ররায়কে দেখাইলেন না। দূতকে বলিয়া দিলেন “কষ্ট স্বীকার করিয়া গোবিন্দমাণিক্যের এতদূর আসিবার দরকার নাই। সৈন্য ও তরবারী লইয়া মহারাজ নক্ষত্রমাণিক্য শীঘ্রই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। গোবিন্দমাণিক্য এই অল্প কাল যেন প্রিয় ভ্রাতৃ বিরহে অধিক কাতর হইয়া না পড়েন। আট বৎসর নির্ব্বাসনে থাকিলে ইহা অপেক্ষা আরো অনেক অধিককাল বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ছিল।”

রঘুপতি নক্ষত্ররায়কে গিয়া কহিলেন “গোবিন্দমাণিক্য নির্ব্বাসিত ছোট ভাইকে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ একখানি চিঠি লিখিয়াছেন।”

নক্ষত্ররায় পরম উপেক্ষার ভান করিয়া হাসিয়া বলি-

লেন "সত্য না কি! কি চিঠি! কই দেখি!" বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন।

রঘুপতি কহিলেন "সে চিঠি মহারাজকে দেখান আমি আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। তখনই ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। বলিয়াছি যুদ্ধ ছাড়া ইহার আর কোন উত্তর নাই।"

নক্ষত্ররায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন "বেশ করিয়াছ ঠাকুর! তুমি বলিয়াছ যুদ্ধ ছাড়া ইহার আর কোন উত্তর নাই? বেশ উত্তর দিয়াছ।",

রঘুপতি কহিলেন "গোবিন্দমাণিক্য উত্তর শুনিয়া ভাবিবে যে, যখন নির্ব্বাসন দিয়াছিলাম তখন ত ভাই বেশ সহজে গিয়াছিল, কিন্তু সেই ভাই ঘরে ফিরিয়া আসিবার সময় ত কম গোলযোগ করিতেছে না।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "মনে করিবেন ভাইটি বড় সহজ লোক নয়! মনে করিলেই যে যখন ইচ্ছা নির্ব্বাসন দিব এবং যখন ইচ্ছা ডাকিয়া লইব সেটি হইবার যো নাই।" বলিয়া অত্যন্ত আনন্দে দ্বিতীয়বার হাসিতে লাগিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নক্ষত্ররায়ের উত্তর শুনিয়া গোবিন্দমাণিক্য অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। বিল্বন মনে করিলেন এবারে হয়ত মহারাজা আপত্তি প্রকাশ করিবেন না। কিন্তু গোবিন্দ-

মাণিক্য বলিলেন "একথা কখনই নক্ষত্ররায়ের কথা নহে। এ সেই পুরোহিত বলিয়া পাঠাইয়াছে। নক্ষত্রের মুখ দিয়া এমন কথা কখনই বাহির হইতে পারে না।"

বিল্বন কহিলেন "মহারাজ এক্ষণে কি উপায় স্থির করিলেন।"

রাজা কহিলেন "আমি নক্ষত্রের সঙ্গে কোন ক্রমে একবার দেখা করিতে পাই, তাহা হইলে সমস্ত মিটমাট করিয়া দিতে পারি।"

বিল্বন কহিলেন "আর দেখা যদি না হয়?"

রাজা "তাহা হইলে আমি রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইব।"

বিল্বন কহিলেন "আচ্ছা আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

পাহাড়ের উপর নক্ষত্ররায়ের শিবির। ঘন জঙ্গল। বাঁশ বন, বেত বন, খাগ্‌ড়ার বন। নানাবিধ লতাগুল্মে ভূমি আচ্ছন্ন। সৈন্যেরা বন্য হস্তীদের চলিবার পথ অনুসরণ করিয়া শিখরে উঠিয়াছে। তখন অপরাহ্ণ। সূর্য্য পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে হেলিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ব প্রান্তে অন্ধকার করিয়াছে। গোধূলির ছায়া ও তরুর ছায়ায় মিলিয়া বনের মধ্যে অকালে সন্ধ্যার আবির্ভাব হইয়াছে। শীতের সায়াহ্নে ভূমিতল হইতে কোয়াশার মত বাষ্প উঠিতেছে। ঝিল্লির শব্দে নিস্তব্ধ বন মুখরিত হইয়া উঠি-

য়াছে। বিল্বন যখন শিবিরে গিয়া পৌঁছিলেন তখন সূর্য্য সম্পূর্ণ অস্ত গেছেন কিন্তু পশ্চিম আকাশে স্বর্ণ রেখা মিলাইয়া যায় নাই। পশ্চিম দিকের সমতল উপত্যকায় স্বর্ণচ্ছায়ায় রঞ্জিত ঘন বন নিস্তব্ধ সবুজ সমুদ্রের মত দেখা-ইতেছে। সৈন্যেরা কাল প্রভাতে যাত্রা করিবে। রঘু-পতি একদল সেনা ও সেনাপতিকে সঙ্গে লইয়া পথ অন্বেষণে বাহির হইয়াছেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই। [illegible] রঘুপতির অজ্ঞাতসারে নক্ষত্ররায়ের নিকটে কোন লোক আসা নিষেধ ছিল, তথাপি সন্যাসীবেশধারী বিল্বনকে কেহই বাধা দিল না। বিল্বন নক্ষত্ররায়কে গিয়া কহিলেন "মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য আপনাকে স্মরণ করিয়া এই পত্র লিখিয়াছেন।" বলিয়া পত্র নক্ষত্ররায়ের হস্তে দিলেন। নক্ষত্ররায় কম্পিত হস্তে পত্র গ্রহণ করিলেন। সে পত্র খুলিতে তাঁহার লজ্জা ও ভয় হইতে লাগিল। যতক্ষণ রঘুপতি, গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁহার মধ্যে আড়াল করিয়া দাঁড়ায় ততক্ষণ নক্ষত্ররায় বেশ নিশ্চিন্ত থাকেন। তিনি কোন মতেই গোবিন্দমাণিক্যকে যেন দেখিতে চান না। গোবিন্দমাণিক্যের এই দূত একেবারে নক্ষত্ররায়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে নক্ষত্ররায় কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন, এবং মনে মনে ঈষৎ বিরক্ত হইলেন। ইচ্ছা হইতে লাগিল রঘুপতি যদি উপস্থিত থাকিতেন এবং এই দূতকে তাঁহার কাছে আসিতে না দিতেন। মনের মধ্যে

নানা ইতস্তত করিয়া পত্র খুলিলেন। তাহার মধ্যে কিছুমাত্র ভৎর্সনা ছিল না। গোবিন্দমাণিক্য তাঁহাকে লজ্জা দিয়া একটি কথাও বলেন নাই, ভাইয়ের প্রতি লেশমাত্র অভিমান প্রকাশ করেন নাই। নক্ষত্ররায় যে, সৈন্য সামন্ত লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন সে কথার উল্লেখ মাত্র করেন নাই। উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বে যেমন ভাব ছিল, এখনও অবিকল যেন সেই ভাবই আছে। অথচ সমস্ত পত্রের মধ্যে একটি সুগভীর স্নেহ ও গম্ভীর বিষাদের ভাব প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে—তাহা কোন স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত হয় নাই বলিয়া নক্ষত্ররায়ের হৃদয়ে অধিক আঘাত লাগিল। চিঠি পড়িতে পড়িতে অল্পে অল্পে তাঁহার মুখ ভাবের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। হৃদয়ের পাষাণ আবরণ দেখিতে দেখিতে ফাটিয়া গেল। চিঠি তাঁহার কম্পমান হাতে কাঁপিতে লাগিল। সে চিঠি লইয়া কিয়ৎক্ষণ মাথায় ধারণ করিয়া রাখিলেন। সে চিঠির মধ্যে ভ্রাতার যে আশীর্ব্বাদ ছিল তাহা যেন শীতল নির্ঝরের মত তাঁহার তপ্ত হৃদয়ে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির হইয়া সুদূর পশ্চিমের সন্ধ্যারাগরক্ত শ্যামল বনভূমির দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। চারিদিকে নিস্তব্ধ সন্ধ্যা অতলস্পর্শ শব্দহীন শান্ত সমুদ্রের মত জাগিয়া রহিল। ক্রমে তাঁহার চক্ষে জল দেখা দিল, দ্রুতবেগে অশ্রু পড়িতে লাগিল। সহসা লজ্জায় ও অনুতাপে

নক্ষত্ররায় দুই হাতে মুখ প্রচ্ছন্ন করিয়া ধরিলেন। কাঁদিয়া বলিলেন "আমি এ রাজ্য চাই না। দাদা, আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আমাকে তোমার পদতলে স্থান দাও। আমাকে তোমার কাছে রাখিয়া দাও। আমাকে দূরে তাড়াইয়া দিও না।" বিল্বন একটি কথাও বলিলেন না—আর্দ্র হৃদয়ে চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে নক্ষত্ররায় যখন প্রশান্ত হইলেন তখন বিল্বন কহিলেন "যুবরাজ, আপনার পথ চাহিয়া গোবিন্দমাণিক্য বসিয়া আছেন আর বিলম্ব করিবেন না।"

নক্ষত্ররায় জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাকে তিনি কি মাপ করিবেন?"

বিল্বন কহিলেন "তিনি যুবরাজের প্রতি কিছুমাত্র রাগ করেন নাই। অধিক রাত্রি হইলে পথে কষ্ট হইবে, শীঘ্র একটি অশ্ব লউন। পর্ব্বতের নীচে মহারাজের লোক অপেক্ষা করিয়া আছে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "আমি গোপনে পলায়ন করি সৈন্যদের কিছু জানাইয়া কাজ নাই। আর তিলমাত্র বিলম্ব করিয়া কাজ নাই, যত শীঘ্র এখান হইতে বাহির হইয়া পড়া যায় ততই ভাল।"

বিল্বন কহিলেন "ঠিক কথা।"

তিনমুড়া পাহাড়ে সন্ন্যাসীর সহিত শিবলিঙ্গের পূজা করিতে যাইতেছেন' বলিয়া নক্ষত্ররায় বিল্বনের সহিত

অশ্বারোহনে যাত্রা করিলেন। অনুচরগণ সঙ্গে যাইতে চাহিল। তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন।

সবে বাহির হইয়াছেন মাত্র, এমন সময়ে অশ্বের খুর-ধ্বনি ও সৈন্যদের কোলাহল শুনিতে পাইলেন। নক্ষত্ররায় নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে রঘুপতি সৈন্য লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন "মহারাজ, কোথায় যাইতেছেন?" নক্ষত্ররায় কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না।

নক্ষত্ররায়কে নিরুত্তর দেখিয়া বিল্বন কহিলেন "মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন।"

রঘুপতি বিল্বনের আপদ মস্তক একবার নিরীক্ষণ করিলেন। একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, তার পরে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন "আজ এমন অসময়ে আমরা আমাদের মহারাজকে বিদায় দিতে পারি না। ব্যস্ত হইবার ত কোন কারণ নাই। কাল প্রাতঃকালে যাত্রা করিলেইত হইবে! কি বলেন মহারাজ?"

নক্ষত্ররায় মৃদুস্বরে কহিলেন "কাল সকালেই যাইব, আজ রাত হইয়া গেছে।"

বিল্বন নিরাশ হইয়া সে রাত্রি শিবিরেই যাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে নক্ষত্ররায়ের নিকটে যাইবার চেষ্টা করিলেন সৈন্যেরা বাধা দিল। দেখিলেন চতুর্দ্দিকে পাহারা।

কোন দিকে ছিদ্র নাই। অবশেষে রঘুপতির নিকট গিয়া কহিলেন "যাত্রার সময় হইয়াছে যুবরাজকে সংবাদ দিন।"

রঘুপতি কহিলেন "মহারাজ যাইবেন না স্থির করিয়াছেন।"

বিল্বন কহিলেন "আমি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।"

রঘুপতি "সাক্ষাৎ হইবে না তিনি বলিয়া দিয়াছেন।"

বিল্বন কহিলেন "মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের পত্রের উত্তর চাই।"

রঘুপতি "পত্রের উত্তর ইতিপূর্ব্বে আরেকবার দেওয়া হইয়াছে।"

বিল্বন "আমি তাঁহার নিজ মুখে উত্তর শুনিতে চাই।"

রঘুপতি "তাহার কোন উপায় নাই।"

বিল্বন বুঝিলেন বৃথা চেষ্টা; কেবল সময় ও বাক্যব্যয়। যাইবার সময় রঘুপতিকে বলিয়া গেলেন—"ব্রাহ্মণ, এ কি সর্ব্বনাশ সাধনে তুমি প্রবৃত্ত হইয়াছ! এ ত ব্রাহ্মণের কাজ নয়!"

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিল্বন ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন, ইতিমধ্যে রাজা অনেক চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে কুকীদলকে বিদায় করিয়া দিয়াছেন। তাহারা রাজ্য মধ্যে উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

সৈন্যদল প্রায় ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। যুদ্ধের উদ্যোগ বড় একটা কিছু নাই। বিল্বন ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে সমস্ত বিবরণ বলিলেন।

রাজা কহিলেন "তবে ঠাকুর, আমি বিদায় হই; নক্ষত্রের জন্য রাজ্য ধন রাখিয়া দিয়া চলিলাম।"

বিল্বন কহিলেন—"অসহায় প্রজাদিগকে পরহস্তে ফেলিয়া দিয়া তুমি পলায়ন করিবে, ইহা স্মরণ করিয়া আমি কোন মতেই প্রসন্ন মনে বিদায় দিতে পারি না, মহারাজ! বিমাতার হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া ভারমুক্ত মাতা শান্তিলাভ করিলেন—ইহা কি কল্পনা করা যায়!"

রাজা কহিলেন "ঠাকুর, তোমার বাক্য আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া প্রবেশ করে। কিন্তু এবার আমাকে মার্জ্জনা কর, আমাকে আর অধিক কিছু বলিও না। আমাকে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিও না। তুমি জান ঠাকুর, আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম রক্তপাত আর করিব না, সে প্রতিজ্ঞা আমি ভাঙ্গিতে পারি না।"

বিল্বন কহিলেন "তবে এখন মহারাজ কি করিবেন?"

রাজা কহিলেন "তবে তোমাকে সমস্ত বলি। আমি ধ্রুবকে সঙ্গে করিয়া বনে যাইব। ঠাকুর, আমার জীবন অত্যন্ত অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহার কিছুই করিতে পারি নাই—জীবনের যত খানি চলিয়া গেছে তাহা ফিরিয়া পাইয়া আর নূতন করিয়া

গড়িতে পারিব না—আমার মনে হইতেছে ঠাকুর অদৃষ্ট যেন আমাদিগকে তীরের মত নিক্ষেপ করিয়াছে, লক্ষ্য হইতে যদি একবার একটু বাঁকিয়া গিয়া থাকি, তবে আর যেন সহস্র চেষ্টায় লক্ষ্যের মুখে ফিরিতে পারি না। জীবনের আরম্ভ সময়ে আমি সেই যে বাঁকিয়া গিয়াছি জীবনের শেষকালে আমি আর লক্ষ্য খুঁজিয়া পাইতেছি না। যাহা মনে করি তাহা আর হয় না। যে সময়ে জাগিলে আত্মরক্ষা করিতে পারিতাম, সে সময়ে জাগি নাই, যে সময়ে ডুবিয়াছি তখন চৈতন্য হইয়াছে। সমুদ্রে পড়িলে লোকে যে ভাবে কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বন করে আমি বালক ধ্রুবকে সেইভাবে অবলম্বন করিতেছি। আমি ধ্রুবের মধ্যে আত্মসমাধান করিয়া ধ্রুবের মধ্যে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিব। আমি প্রথম হইতে ধ্রুবকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিব। ধ্রুবের সহিত তিলে তিলে আমিই বাড়িতে থাকিব। আমার মানব জন্ম সম্পূর্ণ করিব। ঠাকুর, আমি মানুষের মত নই আমি রাজা হইয়া কি করিব!”

শেষ কথাটা রাজা অত্যন্ত আবেগের সহিত উচ্চারণ করিলেন—শুনিয়া ধ্রুব রাজার হাঁটুর উপর তাহার মাথা ঘসিয়া ঘসিয়া কহিল “আমি আজা!”

বিল্বন হাসিয়া ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইলেন। অনেকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অবশেষে রাজাকে কহিলেন “বনে কি কখন মানুষ গড়া যায়! বনে কেবল একটা

উদ্ভিদ্‌ পালন করিয়া তোলা যাইতে পারে। মানুষ মনুষ্য সমাজেই গঠিত হয়।"

রাজা কহিলেন "আমি নিতান্তই বনবাসী হইব না, মনুষ্য সমাজ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে থাকিব মাত্র, অথচ সমাজের সহিত সমস্ত যোগ বিচ্ছিন্ন করিব না। এ কেবল দিনকতকের জন্য।"

এদিকে নক্ষত্ররায় সৈন্যসমেত রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। প্রজাদিগের ধন ধান্য লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রজারা কেবল গোবিন্দমাণিক্যকেই অভিশাপ দিতে লাগিল। তাহারা কহিল এ সমস্তই কেবল রাজার পাপে ঘটিতেছে. রাজা একবার রঘুপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। রঘুপতি উপস্থিত হইলে তাহাকে কহিলেন— "আর কেন প্রজাদিগকে কষ্ট দিতেছ! আমি নক্ষত্ররায়কে রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছি। তোমার মোগল সৈন্যদের বিদায় করিয়া দাও।"

রঘুপতি কহিলেন "যে আজ্ঞা, আপনি বিদায় হইলেই আমি মোগল সৈন্যদের বিদায় করিয়া দিব—ত্রিপুরা লুণ্ঠিত হয় ইহা আমার ইচ্ছা নহে।"

রাজা সেই দিনই রাজ্য ছাড়িয়া যাত্রার উদ্যোগ করিলেন, তাঁহার রাজবেশ ত্যাগ করিলেন। গেরুয়া বসন পরিলেন। নক্ষত্ররায়কে রাজার সমস্ত কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া এক দীর্ঘ আশীর্ব্বাদ পত্র লিখিলেন। অবশেষে রাজা

ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া বলিলেন "ধ্রুব, আমার সঙ্গে বনে যাবে বাছা ?"

ধ্রুব তৎক্ষণাৎ রাজার গলা জড়াইয়া কহিল "যাব !"

এমন সময়ে রাজার সহসা মনে হইল ধ্রুবকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইলে তাহার খুড়া কেদারেশ্বরের সম্মতি আবশ্যক। কেদারেশ্বরকে ডাকাইয়া রাজা কহিলেন "কেদারেশ্বর, তোমার সম্মতি পাইলে আমি ধ্রুবকে আমার সঙ্গে লইয়া যাই।"

ধ্রুব দিন রাত্রি রাজার কাছেই থাকিত, তাহার খুড়ার সহিত তাহার বড় একটা সম্পর্ক ছিল না, এই জন্যই বোধ করি রাজার কখন মনে হয় নাই যে ধ্রুবকে সঙ্গে লইয়া গেলে কেদারেশ্বরের কোন আপত্তি হইতে পারে। রাজার কথা শুনিয়া কেদারেশ্বর কহিল "সে আমি পারিব না মহারাজ।"

শুনিয়া রাজার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। সহসা তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন "কেদারেশ্বর তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।"

কেদারেশ্বর "না মহারাজ বনে যাইতে পারিব না।"

রাজা কাতর হইয়া কহিলেন "আমি বনে যাইব না ; আমি ধন জন লইয়া লোকালয়ে থাকিব।"

কেদারেশ্বর কহিল "আমি দেশ ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।"

রাজা কিছু না বলিয়া গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার সমস্ত আশা ম্রিয়মাণ হইয়া গেল। নিমেষের মধ্যে সমস্ত ধরণীর মুখ যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ধ্রুব আপন মনে খেলা করিতেছিল—অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন অথচ তাহাকে যেন চোখে দেখিতে পাইলেন না। ধ্রুব তাঁহার কাপড়ের প্রান্ত ধরিয়া টানিয়া কহিল "খেলা কর।" রাজার সমস্ত হৃদয় গলিয়া অশ্রু হইয়া চোখের কাছে আসিল। অনেক কষ্টে অশ্রুজল দমন করিলেন। মুখ ফিরাইয়া ভগ্ন হৃদয়ে কহিলেন "তবে ধ্রুব রহিল। আমি একাই যাই।" অবশিষ্ট জীবনের সুদীর্ঘ মরুময় পথ যেন নিমেষের মধ্যে বিদ্যুতালোকে তাঁহার চক্ষু-তারকায় অঙ্কিত হইল।

কেদারেশ্বর ধ্রুবর খেলা ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে কহিল "আয়, আমার সঙ্গে আয়!" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিল।

ধ্রুব ক্রন্দনের স্বরে বলিয়া উঠিল "না।" রাজা সচকিত হইয়া ধ্রুবর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। ধ্রুব ছুটিয়া আসিয়া রাজাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকাইল। রাজা ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিলেন। বিশাল হৃদয় বিদীর্ণ হইতে চাহিতেছিল, ক্ষুদ্র ধ্রুবকে বুকের কাছে চাপিয়া হৃদয়কে দমন করিলেন। ধ্রুবকে

সেই অবস্থায় কোলে রাখিয়া তিনি দীর্ঘ কক্ষে পদচারণ করিতে লাগিলেন, ধ্রুব কাঁধে মাথা রাখিয়া অত্যন্ত স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল।

অবশেষে যাত্রার সময় হইল। ধ্রুব রাজার কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘুমন্ত ধ্রুবকে ধীরে ধীরে কেদারেশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়া রাজা যাত্রা করিলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বদ্বার দিয়া সৈন্য সামন্ত লইয়া নক্ষত্রমাণিক্য রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন, কিঞ্চিৎ অর্থ ও গুটিকতক অনুচর লইয়া পশ্চিম দ্বারাভিমুখে গোবিন্দমাণিক্য যাত্রা করিলেন। নগরের লোক বাঁশি বাজাইয়া ঢাক ঢোলের শব্দ করিয়া হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির সহিত নক্ষত্ররায়কে আহ্বান করিল। গোবিন্দমাণিক্য যে পথ দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন সে পথে কেহই তাঁহাকে সমাদর করা আবশ্যক বিবেচনা করিল না। দুই পার্শ্বের কুটীরবাসিনী রমণীরা তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া গালি দিতে লাগিল, ক্ষুধায় ও ক্ষুধিত সন্তানের ক্রন্দনে তাহাদের জিহ্বা শাণিত হইয়াছে। পরশ্ব গুরুতর দুর্ভিক্ষের সময় যে বৃদ্ধা রাজদ্বারে গিয়া আহার পাইয়াছিল এবং রাজা স্বয়ং যাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, সে তাহার শীর্ণ হস্ত তুলিয়া রাজাকে অভিশাপ দিতে লাগিল। ছেলেরা জননীর কাছ হইতে শিক্ষা পাইয়া বিদ্রূপ করিয়া

চীৎকার করিতে করিতে রাজার পিছন পিছন চলিল। দক্ষিণে বামে কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সম্মুখে চাহিয়া রাজা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। এক জন জুমিয়া ক্ষেত্র হইতে আসিতেছিল, সে রাজাকে দেখিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল। রাজার হৃদয় আর্দ্র হইয়া গেল, তিনি তাহার নিকটে স্নেহ-আকুল কণ্ঠে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। কেবল এই একটি জুমিয়া তাঁহার সমুদয় সন্তান প্রজাদের হইয়া তাঁহার রাজত্বের অবসানে তাঁহাকে ভক্তিভরে ম্লান-হৃদয়ে বিদায় দিল। রাজার পশ্চাতে ছেলের পাল চীৎকার করিতেছে দেখিয়া সে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে তাড়া করিয়া গেল। রাজা তাহাকে নিষেধ করিলেন। অবশেষে পথের যে অংশে কেদারেশ্বরের কুটীর ছিল, রাজা সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন একবার দক্ষিণে ফিরিয়া চাহিলেন। এখন শীতের প্রাতঃকাল। কুয়াশা কাটিয়া সূর্য্যরশ্মি সবে দেখা দিয়াছে। কুটীরের দিকে চাহিয়া রাজার গতবৎসরের আষাঢ় মাসের এক প্রাতঃকাল মনে পড়িল। তখন ঘনমেঘ ঘন বর্ষা। দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্রের ন্যায় বালিকা হাসি অচেতনে শয্যার প্রান্তে মিলাইয়া শুইয়া আছে। ক্ষুদ্র তাতা কিছুই না বুঝিতে পারিয়া কখন বা দিদির অঞ্চলের প্রান্ত মুখে পূরিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া আছে, কখন বা তাহার গোলগোল ছোট ছোট মোটা মোটা হাত দিয়া আস্তে আস্তে দিদির মুখ চাপড়া-

ইতেছে। আজিকার এই অগ্রহায়ণ মাসের শিশিরসিক্ত শুভ্র প্রাতঃকাল সেই আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। রাজার কি মনে পড়িল যে, যে অদৃষ্ট আজ তাঁহাকে রাজ্যত্যাগী ও অপমানিত করিয়া গৃহ হইতে বিদায় করিয়া দিতেছে, সেই অদৃষ্ট এই ক্ষুদ্র কুটীর দ্বারে সেই আষাঢ়ের অন্ধকার প্রাতঃকালে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল? এই খানেই তাহার সহিত সেই প্রথম সাক্ষাৎ। রাজা অন্যমনস্ক হইয়া এই কুটীরের সম্মুখে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। তাঁহার অনুচরগণ ছাড়া তখন পথে আর কেহ লোক ছিল না। জুমিয়ার নিকট তাড়া খাইয়া ছেলে গুলো পালাইয়াছে। কিন্তু জুমিয়া দূরবর্ত্তী হইতেই আবার তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের চীৎকারে চেতনা লাভ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া রাজা আবার ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। সহসা বালকদিগের চীৎকারের মধ্যে একটি সুমিষ্ট পরিচিত কণ্ঠ তাঁহার কানে আসিয়া প্রবেশ করিল। দেখিলেন ছোট ধ্রুব তাহার ছোট ছোট পা ফেলিয়া দুই হাত তুলিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিতেছে। কেদারেশ্বর নূতন রাজাকে আগেভাগে সম্মান প্রদর্শন করিতে গিয়াছে, কুটীরে কেবল ধ্রুব এবং এক বৃদ্ধা পরিচারিকা ছিল। গোবিন্দমাণিক্য ঘোড়া থামাইয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলেন। ধ্রুব ছুটিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া একেবারে তাঁহার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল,

তাঁহার কাপড় ধরিয়া টানিয়া তাঁহার হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া তাহার প্রথম আনন্দের উচ্ছ্বাস অবসান হইলে পর, সে গম্ভীর হইয়া রাজাকে বলিল "আমি টক্‌টক্ চ'ব।" রাজা তাহাকে ঘোড়ায় চড়াইয়া দিলেন। ঘোড়ার উপরে চড়িয়া সে রাজার গলা জড়াইয়া ধরিল, এবং তাহার কোমল কপোলখানি রাজার কপোলের উপরে নিবিষ্ট করিয়া রাখিল। ধ্রুব তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে রাজার মধ্যে কি একটা পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে লাগিল। গভীর ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য লোকে যেমন নানারূপ চেষ্টা করে—ধ্রুব তেমনি তাঁহাকে টানিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া তাঁহাকে চুমো খাইয়া কোন ক্রমে তাঁহার পূর্ব্বভাব ফিরাইয়া আনিবার অনেক চেষ্টা করিল। অবশেষে অকৃতকার্য্য হইয়া মুখের মধ্যে গোটা দুয়েক আঙ্গুল পূরিয়া দিয়া বসিয়া রহিল। রাজা ধ্রুবের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বারবার চুম্বন করিলেন। অবশেষে কহিলেন "ধ্রুব আমি তবে যাই।"

ধ্রুব রাজার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল "আমি যাব।"

রাজা কহিলেন "তুমি কোথায় যাবে বাবা, তুমি তোমার কাকার কাছে থাক।"

ধ্রুব কহিল "না, আমি যাব।"

এমন সময় কুটীর হইতে বৃদ্ধা পরিচারিকা বিড়বিড় করিয়া বকিতে বকিতে উপস্থিত হইল, সবেগে ধ্রুবের হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল "চল্!"

ধ্রুব অম্‌নি সভয়ে সবলে দুই হাতে রাজাকে জড়াইয়া রাজার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া রাখিল। রাজা কাতর হইয়া ভাবিলেন বক্ষের শিরা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা যায় তবু এ দুটি হাতের বন্ধন কি ছেঁড়া যায়! কিন্তু তাও ছিঁড়িতে হইল। আস্তে আস্তে ধ্রুবের দুই হাত খুলিয়া বলপূর্ব্বক ধ্রুবকে পরিচারিকার হাতে দিলেন। ধ্রুব প্রাণপণে কাঁদিয়া উঠিল, হাত তুলিয়া কহিল "বাবা, আমি যাব!" রাজা আর পিছনে না চাহিয়া দ্রুত ঘোড়ায় চড়িয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। যতদূর যান ধ্রুবের আকুল ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন—ধ্রুব কেবল তাহাব দুই হাত তুলিয়া বলিতে লাগিল "বাবা আমি যাব।" অবশেষে রাজার প্রশান্ত চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল—তিনি আর পথঘাট কিছু দেখিতে পাইলেন না। বাষ্পজলে সূর্য্যালোক এবং সমস্ত জগৎ যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ঘোড়া যে দিকে ইচ্ছা ছুটিতে লাগিল।

পথের মধ্যে এক জায়গায় একদল মোগল সৈন্য আসিয়া রাজাকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে লাগিল, এমন কি তাঁহার অনুচরদের সহিত কিঞ্চিৎ কঠোর বিদ্রূপ আরম্ভ করিল। রাজার একজন সভাসদ অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন, তিনি এই দৃশ্য দেখিয়া রাজার নিকটে ছুটিয়া আসিলেন; কহিলেন "মহারাজ এ অপমান ত আর সহ্য হয় না। মহারাজের এই দীনবেশ দেখিয়া ইহারা এরূপ সাহসী

হইয়াছে। এই লউন তরবারী, এই লউন্ উষ্ণীষ। মহারাজ কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমি আমার লোক লইয়া আসিয়া এই বর্ব্বরদিগকে একবার শিক্ষা দিই।”

রাজা কহিলেন “না নয়নরায়, আমার তরবারী উষ্ণীষে প্রয়োজন নাই। ইহারা আমার কি করিবে! আমি এখন ইহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর অপমান সহ্য করিতে পারি। পুনরু তরবারী তুলিয়া আমি এ পৃথিবীর লোকের নিকট হইতে আর সম্মান আদায় করিতে চাহিনা। পৃথিবীর সর্ব্ব-সাধারণে যেরূপ সুসময়ে দুঃসময়ে মান অপমান সুখ দুঃখ সহ্য করিয়া থাকে আমিও জগদীশ্বরের মুখ চাহিয়া সেইরূপ সহ্য করিব। বন্ধুরা বিপক্ষ হইতেছে, আশ্রিতেরা কৃতঘ্ন হইতেছে, প্রণতেরা দুর্ব্বিনীত হইয়া উঠিতেছে, এককালে হয়ত ইহা আমার অসহ্য হইত, কিন্তু এখন ইহা সহ্য করিয়াই আমি হৃদয়ের মধ্যে আনন্দ লাভ করিতেছি। যিনি আমার বন্ধু তাঁহাকে আমি জানিয়াছি। যাও নয়ন-রায়, তুমি ফিরিয়া যাও, নক্ষত্রকে সমাদরপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া আন; আমাকে যেমন সম্মান করিতে নক্ষত্রকেও তেমনি সম্মান করিও। তোমরা সকলে মিলিয়া সর্ব্বদা নক্ষত্রকে সুপথে এবং প্রজার কল্যাণে রক্ষা কর, তোমা-দের কাছে আমার বিদায় কালের এই প্রার্থনা। দেখিও, ভ্রমেও কখন যেন আমার কথার উল্লেখ করিয়া বা আমার সহিত তুলনা করিয়া তাহার তিলমাত্র নিন্দা করিও না।

তবে আমি বিদায় হই” বলিয়া রাজা তাঁহার সভাসদের সহিত কোলাকুলি করিয়া অগ্রসর হইলেন। সভাসদ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অশ্রুজল মুছিয়া চলিয়া গেলেন।

যখন গোমতী তীরের উচ্চ পাড়ের কাছে গিয়া পৌঁছিলেন তখন বিল্বন ঠাকুর অরণ্য হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া অঞ্জলি তুলিয়া কহিলেন “জয় হৌক।” রাজা অশ্ব হইতে নামিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বিল্বন কহিলেন “আমি তোমার কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছি।”

রাজা কহিলেন “ঠাকুর, তুমি নক্ষত্রের কাছে থাকিয়া তাহাকে সৎপরামর্শ দাও। রাজ্যের হিতসাধন কর।”

বিল্বন কহিলেন “না। তুমি যেখানে রাজা নও, সেখানে আমি অকর্ম্মণ্য। এখানে থাকিয়া আমি আর কোন কাজ করিতে পারিব না।”

রাজা কহিলেন “তবে কোথায় যাইবে ঠাকুর! আমাকে যদি দয়া কর, তোমাকে পাইলে আমি দুর্ব্বল হৃদয়ে বল পাই।”

বিল্বন কহিলেন “কোথায় আমার কাজ আছে, আমি তাহাই অনুসন্ধান করিতে চলিলাম। আমি কাছে থাকি আর দূরে থাকি তোমার প্রতি আমার প্রেম কখনও বিচ্ছিন্ন হইবে না জানিও। কিন্তু তোমার সহিত বনে গিয়া আমি কি করিব!”

রাজা মৃদুস্বরে কহিলেন “তবে আমি বিদায় হই।”

বলিয়া দ্বিতীয়বার প্রণাম করিলেন। বিল্বন একদিকে চলিয়া গেলেন। রাজা অন্যদিকে চলিয়া গেলেন।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নক্ষত্ররায় ছত্রমাণিক্য নাম ধারণ করিয়া মহাসমারোহে রাজপদ গ্রহণ করিলেন। রাজকোষে অর্থ অধিক ছিল না। প্রজাদের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া প্রতিশ্রুত অর্থ দিয়া মোগল সৈন্যদের বিদায় করিতে হইল। ঘোরতর দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য লইয়া ছত্রমাণিক্য রাজত্ব করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে অভিশাপ ও ক্রন্দন বর্ষিত হইতে লাগিল।

যে আসনে গোবিন্দমাণিক্য বসিতেন, যে শয্যায় গোবিন্দমাণিক্য শয়ন করিতেন, যে সকল লোক গোবিন্দমাণিক্যের প্রিয় সহচর ছিল, তাহারা যেন রাত্রিদিন নীরবে ছত্রমাণিক্যকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। ছত্রমাণিক্যের ক্রমে তাহা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তিনি চোখের সম্মুখ হইতে গোবিন্দমাণিক্যের সমস্ত চিহ্ন মুছিতে আরম্ভ করিলেন। গোবিন্দমাণিক্যের ব্যবহার্য্য সামগ্রী নষ্ট করিয়া ফেলিলেন, এবং তাঁহার প্রিয় অনুচরদিগকে দূর করিয়া দিলেন। গোবিন্দমাণিক্যের নামগন্ধ তিনি আর সহ্য করিতে পারিতেন না। গোবিন্দমাণিক্যের কোন উল্লেখ হইলেই তাঁহার মনে হইত তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই এই উল্লেখ হইতেছে। সর্ব্বদা মনে হইত সকলে তাঁহাকে রাজা

বলিয়া যথেষ্ট সম্মান করিতেছে না—এই জন্য সহসা অকারণে ক্ষাপা হইয়া উঠিতেন। সভাসদদিগকে শশব্যস্ত থাকিতে হইত। তিনি রাজকার্য্য কিছুই বুঝিতেন না, কিন্তু কেহ পরামর্শ দিতে আসিলে তিনি চটিয়া উঠিয়া বলিতেন "আমি আর এইটে বুঝিনে—তুমি কি আমাকে নির্ব্বোধ পাইয়াছ!" তাঁহার মনে হইত সকলে তাঁহাকে সিংহাসনে অনধিকারী রাজ্যাপহারক জ্ঞান করিয়া মনে মনে তাচ্ছিল্য করিতেছে, এই জন্য সজোরে অত্যধিক রাজা হইয়া উঠিলেন। যথেচ্ছাচরণ করিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার একাধিপত্য প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি যে রাখিলে রাখিতে পারেন মারিলে মারিতে পারেন ইহা বিশেষরূপে প্রমাণ করিবার জন্য যাহাকে রাখা উচিত নহে তাহাকে রাখিলেন, যাহাকে মারা উচিত নহে তাহাকে মারিলেন। প্রজারা অন্নাভাবে মরিতেছে, কিন্তু তাঁহার দিন রাত্রি সমারোহের শেষ নাই—অহরহ নৃত্যগীতবাদ্য ভোজ। ইতিপূর্ব্বে আর কোন রাজা সিংহাসনে চড়িয়া বসিয়া রাজত্বের পেথম সমস্তটা ছড়াইয়া দিয়া এমন অপূর্ব্ব নৃত্য করে নাই।

প্রজারা চারিদিকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল—ছত্রমাণিক্য তাহাতে অত্যন্ত জ্বলিয়া উঠিলেন—তিনি মনে করিলেন এ কেবল রাজার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন। তিনি অসন্তোষের দ্বিগুণ কারণ জন্মাইয়া দিয়া বল পূর্ব্বক

পীড়ন পূর্ব্বক ভয় দেখাইয়া সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন—সমস্ত রাজ্য নিদ্রিত নিশীথের মত নীরব হইয়া গেল। সেই শান্ত নক্ষত্ররায় ছত্রমাণিক্য হইয়া যে সহসা এরূপ আচরণ করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। অনেক সময়ে দুর্ব্বল-হৃদয়েরা প্রভুত্ব পাইলে এই-রূপ প্রচণ্ড ও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠে।

রঘুপতির কাজ শেষ হইয়া গেল। শেষ পর্য্যন্তই যে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে সমান জাগ্রত ছিল তাহা নহে। ক্রমে প্রতিহিংসার ভাব ঘুচিয়া গিয়া যে কাজে হাত দিয়াছেন সেই কাজটা সম্পন্ন করিয়া তোলা তাঁহার একমাত্র ব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। নানা কৌশলে বাধা-বিপত্তি সমস্ত অতিক্রম করিয়া দিন রাত্রি একটা উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি এক প্রকার মাদক সুখ অনু-ভব করিতেছিলেন। অবশেষে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গেল। পৃথিবীতে আর কোথাও সুখ নাই।

রঘুপতি তাঁহার মন্দিরে গিয়া দেখিলেন সেখানে জন-প্রাণী নাই। যদিও রঘুপতি বিলক্ষণ জানিতেন যে জয়-সিংহ নাই, তথাপি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া যেন দ্বিতীয়বার নূতন করিয়া জানিলেন যে জয়সিংহ নাই। এক একবার মনে হইতে লাগিল যেন আছে, তার পরে স্মরণ হইতে লাগিল যে নাই। সহসা বায়ুতে কপাট খুলিয়া গেল তিনি চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন জয়সিংহ আসিল

না। জয়সিংহ যে ঘরে থাকিত, মনে হইল সে ঘরে জয়সিংহ থাকিতেও পারে—কিন্তু অনেকক্ষণ সে ঘরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না—মনে ভয় হইতে লাগিল পাছে গিয়া দেখি জয়সিংহ সেখানে নাই। অবশেষে যখন গোধূলির ঈষৎ অন্ধকারে বনের ছায়া গাঢ়তর ছায়ায় মিলাইয়া গেল, তখন রঘুপতি ধীরে ধীরে জয়সিংহের গৃহে প্রবেশ করিলেন—শূন্য বিজন গৃহ সমাধিভবনের মত নিস্তব্ধ। ঘরের মধ্যে একপাশে একটি কাঠের সিন্ধুক, এবং সিন্ধুকের পার্শ্বে জয়সিংহের এক যোড়া খড়ম ধূলিমলিন হইয়া পড়িয়া আছে। ভিত্তিতে জয়সিংহের স্বহস্তে আঁকা কালীর মূর্ত্তি। ঘরের পূর্ব্ব কোণে একটি ধাতু প্রদীপ ধাতু আধারের উপর দাঁড়াইয়া আছে, গত বৎসর হইতে সে প্রদীপ কেহ জ্বালায় নাই—মাকড়ষার জালে সে আছন্ন হইয়া গিয়াছে। নিকটবর্ত্তী দেয়ালে প্রদীপ শিখার কালো দাগ পড়িয়া আছে। গৃহে পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি দ্রব্য ছাড়া আর কিছুই নাই। রঘুপতি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। সে নিশ্বাস শূন্য গৃহে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। ক্রমে অন্ধকারে আর কিছুই দেখা যায় না। একটা টিক্‌টিকি মাঝে মাঝে কেবল টিক্‌টিক্ শব্দ করিতে লাগিল। মুক্তদ্বার দিয়া ঘরের মধ্যে শীতের বায়ু প্রবেশ করিতে লাগিল। রঘুপতি সিন্ধুকের উপরে বসিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

এইরূপে একমাস এই বিজন মন্দিরে কাটাইলেন,

কিন্তু এমন করিয়া আর দিন কাটে না। পৌরোহিত্য ছাড়িতে হইল। রাজসভায় গেলেন। রাজ্য শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন অবিচার উৎপীড়ন ও বিশৃঙ্খলা ছত্রমাণিক্য নাম ধরিয়া রাজত্ব করিতেছে। তিনি রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা করিলেন। ছত্রমাণিক্যকে পরামর্শ দিতে গেলেন। ছত্রমাণিক্য চটিয়া উঠিয়া বলিলেন "ঠাকুর রাজশাসনকার্য্যের তুমি কি জান! এসব বিষয় তুমি কিছু বুঝ না।" রঘুপতি রাজার প্রতাপ দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। দেখিলেন সে নক্ষত্ররায় আর নাই। রঘুপতির সহিত রাজার ক্রমাগত খিটিমিটি বাধিতে লাগিল। ছত্রমাণিক্য মনে করিলেন যে, রঘুপতি কেবলই ভাবিতেছে যে, রঘুপতিই তাঁহাকে রাজা করিয়া দিয়াছে। এই জন্য রঘুপতিকে দেখিলে তাঁহার অসহ্য বোধ হইত। অবশেষে একদিন স্পষ্ট বলিলেন "ঠাকুর, তুমি তোমার মন্দিরের কাজ করগে। রাজসভায় তোমার কোন প্রয়োজন নাই।" রঘুপতি ছত্রমাণিক্যের প্রতি জলন্ত তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ছত্রমাণিক্য ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

নক্ষত্ররায় যে দিন নগর প্রবেশ করেন, কেদারেশ্বর সেই দিনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়, কিন্তু

বহুচেষ্টাতেও সে তাঁহার নজরে পড়িল না। সৈন্যেরা ও প্রহরীরা তাহাকে ঠেলিয়া ঠুলিয়া তাড়া দিয়া নাড়া দিয়া বিব্রত করিয়া তুলিল। অবশেষে সে প্রাণ লইয়া পলাইয়া যায়। গোবিন্দমাণিক্যের আমলে সে রাজভোগে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া প্রাসাদে বাস করিত—যুবরাজ নক্ষত্ররায়ের সহিত তাহার বিশেষ প্রণয়ও ছিল। কিছুকাল প্রাসাদ-চ্যুত হইয়া তাহার জীবনধারণ করা দায় হইয়া উঠিয়াছে। যখন সে রাজার ছায়ায় ছিল তখন সকলে তাহাকে সভয়ে সম্মান করিত কিন্তু এখন তাহাকে কেহই আর গ্রাহ্য করে না। পূর্ব্বে রাজসভায় কাহারও কিছু প্রয়োজন হইলে তাহাকে হাতে পায়ে আসিয়া ধরিত, এখন পথ দিয়া চলিবার সময় কেহ তাহার সঙ্গে দুটো কথা কহিবার অব-সর পায় না। ইহার উপরে আবার অন্নকষ্টও হইয়াছে। এমন অবস্থায় প্রাসাদে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিতে পারিলে তাহার বিশেষ সুবিধা হয়। সে একদিন অবসরমত কিছু ভেট সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ্য রাজদরবারে ছত্রমাণিক্যের সহিত দেখা করিতে গেল। পরম পরিতোষ প্রকাশ পূর্ব্বক অত্যন্ত পোষ-মানা বিনীত হাস্য হাসিতে হাসিতে রাজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজা তাহাকে দেখিয়াই জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"হাসি কিসের জন্য! তুমি কি আমার সঙ্গেঠাট্টা পাইয়াছ! তুমি এ কি রহস্য করিতে আসিয়াছ!"

অম্‌নি চোপ্‌দার জমাদার বরকন্দাজ মন্ত্রী অমাত্য সকলেই হাঁকার দিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ কেদারেশ্বরের বিকশিত দন্ত পংক্তির উপর যবনিকাপতন হইল।

ছত্রমাণিক্য কহিলেন "তোমার কি বলিবার আছে শীঘ্র বলিয়া চলিয়া যাও।"

কেদারেশ্বরের কি বলিবার ছিল মনে পড়িল না। অনেক কষ্টে সে মনে মনে যে বক্তৃতাটুকু গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা পেটের মধ্যেই চুরমার হইয়া গেল। অবশেষে রাজা যখন বলিলেন "তোমার যদি কিছু বলিবার না থাকে ত চলিয়া যাও।" তখন কেদারেশ্বর চট্‌পট্‌ একটা যা হয় কিছু বলা আবশ্যক বিবেচনা করিল। চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে সহসা প্রচুর পরিমাণে করুণরস সঞ্চার করিয়া বলিল "মহারাজ, ধ্রুবকে কি ভুলিয়া গিয়াছেন?"

ছত্রমাণিক্য অত্যন্ত আগুণ হইয়া উঠিলেন। মূর্খ কেদারেশ্বর কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কহিল "সে যে মহারাজের জন্য কাকা কাকা করিয়া কাঁদিয়া সারা হইতেছে।"

ছত্রমাণিক্য কহিলেন "তোমার আস্পর্দ্ধাত কম নয় দেখিতেছি! তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাকে কাকা বলে? তুমি তাহাকে এই শিক্ষা দিয়াছ!"

কেদারেশ্বর অত্যন্ত কাতর ভাবে যোড়হস্তে কহিল—"মহারাজ—"

ছত্রমাণিক্য কহিলেন "কে আছ হে—ইহাকে আর সেই ছেলেটাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দাওত!" সহসা স্কন্ধের উপর এতগুলো প্রহরীর হাত আসিয়া পড়িল যে কেদারেশ্বর তীরের মত একেবারে বাহিরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। হাত হইতে তাহার ডালি কড়িয়া লইয়া প্রহরীরা তাহা ভাগ করিয়া লইল। ধ্রুবকে লইয়া কেদারেশ্বর ত্রিপুরা পরিত্যাগ করিল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রঘুপতি আবার মন্দিরে ফিরিয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন কোন প্রেমপূর্ণ হৃদয় বস্ত্রাদি লইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া নাই। পাষাণ মন্দির দাঁড়াইয়া আছে তাহার মধ্যে কোথাও হৃদয়ের লেশমাত্র নাই। তিনি গিয়া গোমতী তীরের শ্বেত সোপানের উপর বসিলেন। সোপানের বামপার্শ্বে জয়সিংহের স্বহস্তে রোপিত শেফালিকা গাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে। এই ফুলগুলি দেখিয়া জয়সিংহের সুন্দর মুখ, সরল হৃদয়, সরল জীবন এবং অত্যন্ত সহজ বিশুদ্ধ উন্নত ভাব তাঁহার স্পষ্ট মনে পড়িতে লাগিল। সিংহের ন্যায় সবল তেজস্বী এবং হরিণ শিশুর মত সুকুমার জয়সিংহ রঘুপতির হৃদয়ে সম্পূর্ণ আবির্ভূত হইল—তাঁহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। ইতিপূর্ব্বে তিনি আপনাকে জয়সিংহের চেয়ে অনেক বড় জ্ঞান করি-

তেন, এখন জয়সিংহকে তাঁহার নিজের চেয়ে অনেক বড় মনে হইতে লাগিল। তাঁহার প্রতি জয়সিংহের সেই সরল ভক্তি স্মরণ করিয়া জয়সিংহের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভক্তির উদয় হইল, এবং নিজের প্রতি তাঁহার অভক্তি জন্মিল। জয়সিংহকে যে সকল অন্যায় তিরস্কার করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল—তিনি মনে মনে কহিলেন জয়সিংহকে ভৎর্সনার আমি অধিকারী নই—জয়সিংহের সহিত যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য একটিবার দেখা দেখা হয়, তবে আমি আমার হীনত্ব স্বীকার করিয়া তাহার নিকট একবার মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়া লই। জয়সিংহ যখন যাহা যাহা বলিয়াছে করিয়াছে সমস্ত তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। জয়সিংহের সমস্ত জীবন সংহত ভাবে তাঁহার মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। তিনি এইরূপ একটি মহৎ চরিত্রের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া সমস্ত বিবাদ বিদ্বেষ ভুলিয়া গেলেন। চারিদিকের গুরুভার সংসার লঘু হইয়া গিয়া তাঁহাকে পীড়ন করিতে বিরত হইল। যে নক্ষত্র-মাণিক্যকে তিনিই রাজা করিয়া দিয়াছেন সে যে রাজা হইয়া আজ তাঁহাকেই অপমান করিয়াছে ইহা স্মরণ করিয়া তাঁহার কিছুমাত্র রোষ জন্মিল না। এই মান অপমান সমস্তই সামান্য মনে করিয়া তাঁহার ঈষৎ হাসি আসিল। কেবল তাঁহার ইচ্ছা করিতে লাগিল জয়সিংহ যাহাতে যথার্থ সন্তুষ্ট হয় এমন একটা কিছু কাজ করেন। অথচ

চতুর্দ্দিকে কাজ কিছুই দেখিতে পাইলেন না—চতুর্দ্দিকে শূন্য হাহাকার করিতেছে। এই বিজন মন্দির তাঁহাকে যেন চাপিয়া ধরিল—তাঁহার যেন নিশ্বাস রোধ করিল। একটা কিছু বৃহৎ কাজ করিয়া তিনি হৃদয় বেদনা শান্ত করিয়া রাখিবেন কিন্তু এই সকল নিস্তব্ধ নিরুদ্যম নিরালয় মন্দিরের দিকে চাহিয়া পিঞ্জরবদ্ধ পাখীর মত তাঁহার হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া বনের মধ্যে অধীর ভাবে পদচারণ করিতে লাগিলেন। মন্দিরের ভিতরকার অলস অচেতন অকর্ম্মণ্য জড় প্রতিমাগুলির প্রতি তাঁহার অতিশয় ঘৃণার উদয় হইল। হৃদয় যখন প্রবল বেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে তখন কতকগুলি নিরুদ্যম স্থূল পাষাণ মূর্ত্তির নিরুদ্যম সহচর হইয়া চিরদিন অতিবাহিত করা তাঁহার নিকটে অত্যন্ত হেয় বলিয়া বোধ হইল। যখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইল, রঘুপতি চক্‌মকি ঠুকিয়া একটি প্রদীপ জ্বালাইলেন। দীপহস্তে চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখিলেন চতুর্দ্দশ দেবতা সমান ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। গত বৎসর আষাঢ়ের কালরাত্রে ক্ষীণ দীপালোকে ভক্তের মৃতদেহের সম্মুখে রক্তপ্রবাহের মধ্যে যেমন বুদ্ধিহীন হৃদয়হীনের মত দাঁড়াইয়াছিল, আজও তেম্‌নি দাঁড়াইয়া আছে। রঘুপতি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "মিথ্যা কথা! সমস্ত মিথ্যা! হা বৎস জয়সিংহ, তোমার অমূল্য হৃদয়ের

রক্ত কাহাকে দিলে? এখানে কোন দেবতা নাই! কোন দেবতা নাই! পিশাচ রঘুপতি সে রক্ত পান করিয়াছে!" বলিয়া কালীর প্রতিমা রঘুপতি আসন হইতে টানিয়া তুলিয়া লইলেন। মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সবলে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। অন্ধকারে পাষাণ সোপানের উপর পড়িয়া পাষাণ প্রতিমা শব্দ করিয়া গড়াইতে গড়াইতে গোমতীর জলের মধ্যে পড়িয়া গেল। অজ্ঞান রাক্ষসী পাষাণ আকৃতি ধারণ করিয়া এতদিন রক্ত পান করিতেছিল সে আজ গোমতী গর্ভের সহস্র পাষাণের মধ্যে অদৃশ্য হইল, কিন্তু মানবের কঠিন হৃদয়াসন কিছুতেই পরিত্যাগ করিল না। রঘুপতি দীপ নিবাইয়া দিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলেন সেই রাত্রেই রাজধানী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

নোয়াখালির নিজামৎপুরে বিল্বন ঠাকুর কিছু দিন হইতে বাস করিতেছেন। সেখানে ভয়ঙ্কর মড়কের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি একদিন সমস্ত দিন মেঘ করিয়া থাকে, মাঝে মাঝে অল্প অল্প বৃষ্টিও হয়। অবশেষে সন্ধ্যার সময় রীতিমত ঝড় আরম্ভ হয়। প্রথমে পূর্ব্বদিক হইতে বায়ু বহিতে থাকে।* রাত্রি দ্বিতীয় প্রহ-

রের সময় উত্তর ও উত্তরপূর্ব্ব হইতে প্রবল বেগে ঝড় বহিতে লাগিল। অবশেষে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া ঝড়ের বেগ কমিয়া গেল। এমন সময়ে রব উঠিল বন্যা আসিতেছে। কেহ ঘরের চালে উঠিল কেহ পুষ্করিণীর পাড়ের উপর গিয়া দাঁড়াইল, কেহ বৃক্ষশাখায় কেহ মন্দি-রের চূড়ায় আশ্রয় লইল। অন্ধকার রাত্রি—অবিশ্রাম বৃষ্টি—বন্যার গর্জ্জন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল—আতঙ্কে গ্রামের লোকেরা দিশাহারা হইয়া গেল। এমন সময়ে বন্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। উপরি উপরি দুইবার তরঙ্গ আসিল, দ্বিতীয় বারের পরে গ্রামে প্রায় আট হাত জল দাঁড়াইল। পর-দিন যখন সূর্য্য উঠিল এবং জল নামিয়া গেল, তখন দেখা গেল—গ্রামে গৃহ অল্পই অবশিষ্ট আছে, এবং লোক নাই—অন্য গ্রাম হইতে মানুষ, গোরু, মহিষ, ছাগল এবং শৃগাল কুকুরের মৃতদেহ ভাসিয়া আসিয়াছে। সুপারির গাছগুলা ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া গেছে, গুঁড়ির কিয়দংশমাত্র অবশিষ্ট আছে। বড় বড় আম কাঁঠালের গাছ সমূলে উৎপাটিত হইয়া কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে। অন্য গ্রামের গৃহের চাল ভাসিয়া আসিয়া ভিত্তির শোকে ইতস্তত উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। অনেকগুলো হাঁড়ি কলসী বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। অধিকাংশ কুটীরই বাঁশঝাড় আম কাঁঠাল মাদার প্রভৃতি বড় বড় গাছের দ্বারা আবৃত ছিল, এই জন্য অনেকগুলি মানুষ একেবারে ভাসিয়া না

গিয়া গাছে আট্‌কাইয়া গিয়াছিল। কেহবা সমস্ত রাত্রি বন্যাবেগে দোদুল্যমান বাঁশঝাড়ে ঝুলিয়াছে, কেহবা মাদারের কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত, কেহবা উৎপাটিত বৃক্ষ সমেত ভাসিয়া গেছে। জল সরিয়া গেলে জীবিত ব্যক্তিরা নামিয়া আসিয়া মৃতের মধ্যে বিচরণ করিয়া আত্মীয়দিগকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। অধিকাংশ মৃতদেহই অপরিচিত এবং ভিন্ন গ্রাম হইতে আগত। কেহই তাহাদিগকে সৎকার করিল না। পালে পালে শকুনি আসিয়া মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে লাগিল। শৃগাল কুকুরের সহিত তাহাদের কোন বিবাদ নাই, কারণ শৃগাল কুকুরও সমস্ত মরিয়া গিয়াছে। বারো ঘর পাঠান গ্রামে বাস করিত; তাহারা অনেক উচ্চ জমিতে বাস করিত বলিয়া তাহাদের প্রায় কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই। অবশিষ্ট জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা গৃহ পাইল তাহারা গৃহে আশ্রয় লইল—যাহারা পাইল না তাহারা আশ্রয় অন্বেষণে অন্যত্রে গেল। যাহারা বিদেশে ছিল তাহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিল। ক্রমে অল্পে অল্পে গ্রামে পুনশ্চ লোকের বসতি আরম্ভ হইল। এই সময়ে মৃত দেহে পুষ্করিণীর জল দূষিত হইয়া এবং অন্যান্য নানা কারণে গ্রামে মড়ক আরম্ভ হইল। পাঠানদের পাড়ায় মড়কের প্রথম আরম্ভ হইল। মৃত দেহের গোর-দিবার বা পরস্পরকে সেবা করিবার অবসর কাহারও

রহিল না। হিন্দুরা কহিল মুসলমানেরা গোহত্যা পাপের ফল ভোগ করিতেছে। জাতি-বৈরিতায় এবং জাতিচ্যুতি-ভয়ে কোন হিন্দু তাহাদিগকে জল দিল না বা কোন প্রকার সাহায্য করিল না। বিল্বন সন্ন্যাসী যখন গ্রামে আসিলেন তখন গ্রামের এইরূপ অবস্থা। বিল্বনের কতক-গুলি চেলা জুটিয়াছিল মড়কের ভয়ে তাহারা পালাইবার চেষ্টা করিল। বিল্বন ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে বিরত করিলেন। তিনি পীড়িত পাঠানদিগকে সেবা করিতে লাগিলেন—তাহাদিগকে পথ্য পানীয় ঔষধ এবং তাহাদের মৃতদেহ গোর দিতে লাগিলেন। হিন্দুরা হিন্দু সন্ন্যাসীর অনাচার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বিল্বন কহিতেন "আমি সন্ন্যাসী, আমার কোন জাত নাই। আমার জাত মানুষ। মানুষ যখন মরিতেছে তখন কিসের জাত! ভগবানের সৃষ্ট মানুষ যখন মানুষের প্রেম চাহিতেছে তখনই বা কিসের জাত!" হিন্দুরা বিল্বনের অনাসক্ত পরহিতৈষা দেখিয়া তাঁহাকে ঘৃণা বা নিন্দা করিতে যেন সাহস করিল না। বিল্বনের কাজ ভাল কি মন্দ তাহারা স্থির করিতে পারিল না। তাহাদের অসম্পূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞান সন্দিগ্ধভাবে বলিল "ভাল নহে।" কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের ভিতরে যে মনুষ্য বাস করিতেছে সে বলিল "ভাল।" যাহা হউক, বিল্বন অন্য লোকের ভাল মন্দের দিকে না তাকা-ইয়া কাজ করিতে লাগিলেন। মুমূর্ষু পাঠানেরা তাঁহাকে

দেবতা জ্ঞান করিতে লাগিল। পাঠানের ছোট ছোট ছেলেদের তিনি মড়ক হইতে দূরে রাখিবার জন্য হিন্দুদের কাছে লইয়া গেলেন। হিন্দুরা বিষম শশব্যস্ত হইয়া উঠিল, কেহ তাহাদিগকে আশ্রয় দিল না। তখন বিল্বন একটা বড় পরিত্যক্ত ভাঙ্গা মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ছেলের পাল সেইখানে রাখিলেন। প্রাতে উঠিয়া বিল্বন তাঁহার ছেলেদের জন্য ভিক্ষা করিতে বাহির হইতেন। কিন্তু ভিক্ষা কে দিবে? দেশে শস্য কোথায়! অনাহারে কত লোক মরিবার উপক্রম করিতেছে। গ্রামের মুসলমান জমিদার অনেক দূরে বাস করিতেন। বিল্বন তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। বহুকষ্টে তাঁহাকে রাজি করিয়া তিনি ঢাকা হইতে চাউল আমদানী করিতে লাগিলেন। তিনি পীড়িতদের সেবা করিতেন এবং তাঁহার চেলারা চাউল বিতরণ করিত। মাঝে মাঝে বিল্বন ছেলেদের সঙ্গে গিয়া খেলা করিতেন। তাহারা তাঁহাকে দেখিলে তুমুল কোলাহল উত্থাপন করিত—সন্ধ্যার সময় মন্দিরের পাশ দিয়া গেলে মনে হইত যেন মন্দিরে সহস্র টিয়াপাখী বাসা করিয়াছে। বিল্বনের এস্‌রাজের আকারের একপ্রকার যন্ত্র ছিল, যখন অত্যন্ত শ্রান্ত হইতেন তখন তাহাই বাজাইয়া গান করিতেন। ছেলেগুলো তাঁহাকে ঘিরিয়া কেহবা গান শুনিত, কেহবা যন্ত্রের তার টানিত, কেহবা তাঁহার অনুকরণে গান করিবার চেষ্টা করিয়া বিষম চীৎকার করিত।

অবশেষে মড়ক মুসলমান পাড়া হইতে হিন্দুপাড়ায় আসিল। গ্রামে এক প্রকার অরাজকতা উপস্থিত হইল—চুরি ডাকাতির শেষ নাই—যে যাহা পায় লুঠ করিয়া লয়। মুসলমানেরা দল বাঁধিয়া ডাকাতী আরম্ভ করিল। তাহারা পীড়িতদিগকে শয্যা হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া তক্তা মাদুর বিছানা পর্য্যন্ত হরণ করিয়া লইয়া যাইত। বিল্বন প্রাণপণে তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বিল্বনের কথা তাহারা অত্যন্ত মান্য করিত—লঙ্ঘন করিতে সাহস করিত না। এইরূপে বিল্বন যথাসাধ্য গ্রামের শান্তি রক্ষা করিতেন।

একদিন সকালে বিল্বনের এক চেলা আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, একটি ছেলে সঙ্গে লইয়া একজন বিদেশী গ্রামের অশথ তলায় আশ্রয় লইয়াছে, তাহাকে মড়কে ধরিয়াছে, বোধ করি সে আর বাঁচিবে না। বিল্বন দেখিলেন কেদারেশ্বর অচেতন হইয়া পড়িয়া; ধ্রুব ধূলায় শুইয়া ঘুমাইয়া আছে। কেদারেশ্বরের মুমূর্ষু অবস্থা—পথকষ্টে এবং অনাহারে সে দুর্ব্বল হইয়াছিল, এই জন্য পীড়া তাহাকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়াছে, কোন ঔষধে কিছু ফল হইল না, সেই বৃক্ষতলেই তাহার মৃত্যু হইল। ধ্রুবকে দেখিয়া বোধ হইল যেন বহুক্ষণ অনাহারে ক্ষুধায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিল্বন অতি সাবধানে তাহাকে কোলে তুলিয়া তাঁহার শিশুশালায় লইয়া গেলেন।

দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

চট্টগ্রাম এখন আরাকানের অধীন। গোবিন্দমাণিক্য নির্ব্বাসিত ভাবে চট্টগ্রামে আসিয়াছেন শুনিয়া আরাকানের রাজা মহা সমারোহ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। বলিয়া পাঠাইলেন যদি সিংহাসন পুনরায় অধিকার করিতে চান তাহা হইলে আরাকানপতি তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারেন। গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন "না, আমি সিংহাসন চাই না।" দূত কহিল "তবে আরাকান রাজ-সভায় পূজনীয় অতিথি হইয়া মহারাজ কিছুকাল বাস করুন।" রাজা কহিলেন "আমি রাজসভায় থাকিব না। চট্টগ্রামের এক পার্শ্বে আমাকে স্থান দান করিলে আমি আরাকানরাজের নিকটে ঋণী হইয়া থাকিব।" দূত কহিল "মহারাজের যেখানে অভিরুচি সেইখানেই থাকিতে পারেন। এ সমস্ত আপনারই রাজ্য মনে করিবেন!" আরাকানের কতকগুলি অনুচর রাজার সঙ্গে সঙ্গেই রহিল। গোবিন্দমাণিক্য তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন না, তিনি মনে করিলেন হয়ত বা আরাকান তাঁহাকে সন্দেহ করিয়া তাঁহার নিকটে লোক রাখিতে ইচ্ছা করেন।

ময়ানী নদীর ধারে মহারাজ কুটীর বাঁধিয়াছেন। স্বচ্ছসলিলা ক্ষুদ্র নদী ছোট বড় শিলাখণ্ডের উপর দিয়া দ্রুতবেগে চলিয়াছে। দুই পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণের পাহাড় খাড়া হইয়া আছে—

কালো পাথরের উপর বিচিত্র বর্ণের শৈবাল ঝুলিতেছে—মাঝে মাঝে ছোট ছোট গহ্বর আছে তাহার মধ্যে পাখী বাসা করিয়াছে। স্থানে স্থানে দুই পার্শ্বের পাহাড় এত উচ্চ যে অনেক বিলম্বে সূর্য্যের দুই একটি কর নদীর জলে আসিয়া পতিত হয়। বড় বড় গুল্ম বিবিধ আকারের পল্লব বিস্তার করিয়া পাহাড়ের গাত্রে ঝুলিতেছে। মাঝে মাঝে নদীর দুই তীরে ঘন জঙ্গলের বাহু অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। একটা দীর্ঘ শাখাহীন শ্বেত গর্জ্জন বৃক্ষ পাহাড়ের উপরে হেলিয়া রহিয়াছে, নীচে নদীর চঞ্চল জলে তাহার ছায়া নাচিতেছে, বড় বড় লতা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে। ঘন সবুজ জঙ্গলের মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ শ্যামল কদলী বন। মাঝে মাঝে দুই তীর বিদীর্ণ করিয়া ছোট ছোট নির্ঝর শিশুদিগের ন্যায় আকুল বাহু, চঞ্চল আবেগ ও কলকল শুভ্র হাস্য লইয়া নদীতে আসিয়া পড়িতেছে। নদী কিছু দূর সমভাবে গিয়া স্থানে স্থানে শিলা সোপান বাহিয়া ফেনাইয়া নিম্নাভিমুখে ঝরিয়া পড়িতেছে। সেই অবিশ্রাম ঝর্ঝর শব্দ নিস্তব্ধ শৈল-প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এই ছায়া, শীতল প্রবাহ, স্নিগ্ধ ঝর্ঝর শব্দের মধ্যে স্তব্ধ শৈলতলে গোবিন্দমাণিক্য বাস করিতে লাগিলেন। হৃদয় বিস্তারিত করিয়া দিয়া হৃদয়ের মধ্যে শান্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন—নির্জ্জন প্রকৃতির সান্ত্বনাময় গভীর প্রেম নানা-

দিক্ দিয়া সহস্র নির্ঝরের মত তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে পড়িতে লাগিল। তিনি আপনার হৃদয়ের গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখান হইতে ক্ষুদ্র অভিমান সকল মুছিয়া ফেলিতে লাগিলেন—দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া আপনার মধ্যে বিমল আলোক ও বায়ুর প্রবাহ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কে তাঁহাকে দুঃখ দিয়াছে ব্যথা দিয়াছে, কে তাঁহার স্নেহের বিনিময় দেয় নাই, কে তাঁহার নিকট হইতে এক হস্তে উপকার গ্রহণ করিয়া অপর হস্তে কৃতঘ্নতা অর্পণ করিয়াছে, কে তাঁহার নিকট সমাদৃত হইয়া তাঁহাকে অপমান করিয়াছে, সমস্ত তিনি ভুলিয়া গেলেন। এই শৈলাসনবাসিনী অতি পুরাতন প্রকৃতির অবিশ্রাম কার্য্যশীলতা অথচ চির-নিশ্চিন্ত প্রশান্ত নবীনতা দেখিয়া তিনি নিজেও যেন সেই রূপ পুরাতন সেই রূপ বৃহৎ সেই রূপ প্রশান্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি যেন সুদূর জগৎ পর্য্যন্ত আপনার কামনা-শূন্য স্নেহ বিস্তারিত করিয়া দিলেন—সমস্ত বাসনা দূর করিয়া দিয়া যোড়হস্তে কহিলেন "হে ঈশ্বর, পতনোন্মুখ সম্পৎ-শিখর হইতে তোমার ক্রোড়ের মধ্যে ধারণ করিয়া আমাকে এ যাত্রা রক্ষা করিয়াছ। আমি মরিতে বসিয়াছিলাম আমি বাঁচিয়া গিয়াছি। যখন রাজা হইয়াছিলাম, তখন আমি আমার মহত্ত্ব জানিতাম না, আজ সমস্ত পৃথিবীময় আমার মহত্ত্ব অনুভব করিতেছি।" অবশেষে দুই চক্ষে জল পড়িতে লাগিল—বলিলেন "মহারাজ, তুমি

আমার স্নেহের ধ্রুবকে কাড়িয়া লইয়াছ, সে বেদনা এখনো হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ যায় নাই। যদিও আজ আমি বুঝিয়াছি যে, তুমি ভালই করিয়াছ। আমি সেই বালকের প্রতি স্বার্থপর স্নেহে আমার সমুদয় কর্ত্তব্য আমার জীবন বিসর্জ্জন দিতেছিলাম। তুমি আমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ। আমি ধ্রুবকে আমার সমস্ত পুণ্যের পুরস্কার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম—তুমি তাহাকে কাড়িয়া লইয়া শিক্ষা দিতেছ যে, পুণ্যের পুরস্কার পুণ্য। তাই আজ সেই ধ্রুবের পবিত্র বিরহদুঃখকে সুখ বলিয়া তোমার প্রসাদ বলিয়া অনুভব করিতেছি। আমি বেতন লইয়া ভৃত্যের মত কাজ করিব না প্রভু, আমি তোমার প্রেমের বশ হইয়া তোমার সেবা করিব।”

গোবিন্দমাণিক্য দেখিলেন নির্জ্জনে ধ্যানপরায়না প্রকৃতি যে স্নেহধারা সঞ্চয় করিতেছে, সজনে লোকালয়ের মধ্যে তাহা নদীরূপে প্রেরণ করিতেছে—যে তাহা গ্রহণ করিতেছে, তাহার তৃষ্ণানিবারণ হইতেছে, যে করিতেছে না তাহার প্রতিও প্রকৃতির কোন অভিমান নাই। গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন “আমিও আমার এই বিজনে সঞ্চিতপ্রেম সজনে বিতরণ করিতে বাহির হইব।” বলিয়া তাঁহার পর্ব্বতাশ্রম ছাড়িয়া তিনি বাহির হইলেন।

সহসা রাজত্ব ছাড়িয়া দিয়া উদাসীন হওয়া লেখায় যতটা সহজ মনে হয়—বাস্তবিক ততটা সহজ নহে।

রাজবেশ ছাড়িয়া দিয়া গেরুয়া বস্ত্র পরা নিতান্ত অল্প কথা নহে। বরঞ্চ রাজ্য পরিত্যাগ করা সহজ, কিন্তু আমাদের আজন্ম কালের ছোট ছোট অভ্যাস আমরা অনায়াসে ছাড়িতে পারি না, তাহারা তাহাদের তীব্র ক্ষুধাতৃষ্ণা লইয়া আমাদের অস্থিমাংসের সহিত লিপ্ত হইয়া আছে; তাহা-দিগকে নিয়মিত খোরাক না যোগাইলে তাহারা আমাদের রক্তশোষণ করিতে থাকে। কেহ যেন মনে না করেন যে গোবিন্দমাণিক্য যতদিন তাঁহার বিজন কুটীরে বাস করিতেছিলেন, ততদিন কেবল অবিচলিত চিত্তে স্থানুর মত বসিয়াছিলেন। তিনি পদে পদে আপনার সহস্র ক্ষুদ্র অভ্যাসের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। যখনি কিছুর অভাবে তাঁহার হৃদয় কাতর হইতেছিল তখনি তিনি তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার মনের সহস্রমুখী ক্ষুধাকে কিছু না খাইতে দিয়া বিনাশ করিতেছিলেন। পদে পদে এই শত শত অভাবের উপরে জয়ী হইয়া তিনি সুখ লাভ করিতেছিলেন। যেমন দুরন্ত অশ্বকে দ্রুতবেগে ছুটাইয়া শান্ত করিতে হয়, তেমনি তিনি তাঁহার অভাব-কাতর অশান্ত হৃদয়কে অভাবের মরুময় প্রান্তরের মধ্যে অবিশ্রাম দৌড় করাইয়া শান্ত করিতেছিলেন। অনেক দিন পর্যান্ত এক মুহূর্ত্তও তাঁহার বিশ্রাম ছিল না।

পার্ব্বত্য প্রদেশ ছাড়িয়া গোবিন্দমাণিক্য দক্ষিণে সমু-দ্রাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। সমস্ত বাসনার দ্রব্য বিস-

র্জ্জন দিয়া তিনি হৃদয়ের মধ্যে আশ্চর্য্য স্বাধীনতা অনুভব করিতে লাগিলেন। কেহ তাঁহাকে আর বাঁধিতে পারে না, অগ্রসর হইবার সময় কেহ তাঁহাকে আর বাধা দিতে পারে না। প্রকৃতিকে অত্যন্ত বৃহৎ দেখিলেন এবং আপনাকেও তাহার সহিত এক বলিয়া মনে হইল। বৃক্ষ লতার সে এক নূতন শ্যামল বর্ণ, সূর্য্যের সে এক নূতন কনককিরণ, প্রকৃতির সে এক নূতন মুখশ্রী দেখিতে লাগিলেন। গ্রামে গিয়া মানবের প্রত্যেক কাজের মধ্যে তিনি এক নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। মানবের হাস্যালাপ ওঠা বসা চলা ফেরার মধ্যে তিনি এক অপূর্ব্ব নৃত্যগীতের মাধুরী দেখিতে পাইলেন। যাহাকে দেখিলেন তাহাকে কাছে ডাকিয়া কথা কহিয়া সুখ পাইলেন—যে তাঁহাকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিল তাহার নিকট হইতে তাঁহার হৃদয় দূরে গমন করিল না। সর্ব্বত্র দুর্ব্বলকে সাহায্য করিতে এবং দুঃখীকে সান্তনা দিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল আমার নিজের সমস্ত বল এবং সমস্ত সুখ আমি পরের জন্য উৎসর্গ করিলাম, কেন না আমার নিজের কোন কাজ নাই কোন বাসনা নাই। সচরাচর যে সকল দৃশ্য কাহারো চোখে পড়ে না, তাহা নূতন আকার ধারণ করিয়া তাঁহার চোখে পড়িতে লাগিল। যখন দুই ছেলেকে পথে বসিয়া খেলা করিতে দেখিতেন, দুই ভাইকে, পিতাপুত্রকে, মাতা ও শিশুকে একত্রে দেখিতেন, তাহারা

ধূলিলিপ্ত হউক্‌, দরিদ্র হউক্‌ কদর্য্য হউক্‌, তিনি তাহাদের মধ্যে দূরদূরান্তব্যাপী মানব-হৃদয়সমুদ্রের অনন্ত গভীর প্রেম দেখিতে পাইতেন। একটি শিশুক্রোড়া জননীর মধ্যে তিনি যেন অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত মানবশিশুর জননীকে দেখিতে পাইতেন। দুই বন্ধুকে একত্রে দেখিলেই তিনি সমস্ত মানবজাতিকে বন্ধুপ্রেমে সহায়বান্‌ অনুভব করিতেন। পূর্ব্বে যে পৃথিবীকে মাঝে মাঝে মাতৃহীনা বলিয়া বোধ হইত, সেই পৃথিবীকে আনতনয়না চিরজাগ্রত জননীর কোলে দেখিতে পাইলেন। পৃথিবীর দুঃখ শোক দারিদ্র্য বিবাদ বিদ্বেষ দেখিলেও তাঁহার মনে আর নৈরাশ্য জন্মিত না। একটি মাত্র মঙ্গলের চিহ্ন দেখিলেই তাঁহার আশা সহস্র অমঙ্গল ভেদ করিয়া স্বর্গাভিমুখে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত। আমাদের সকলের জীবনেই কি কোন না কোন দিন এমন এক অভূতপূর্ব্ব নূতন প্রেম ও নূতন স্বাধীনতার প্রভাত উদিত হয় নাই যে দিন সহসা এই হাস্যক্রন্দনময় জগৎকে এক সুকোমল নবকুমারের মত এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রেম ও মঙ্গলের ক্রোড়ে বিকশিত দেখিয়াছি! যে দিন কেহ আমাদিগকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে না, কেহ আমাদিগকে জগতের কোন সুখ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না, কেহ আমাদিগকে কোন প্রাচীরের মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। যে দিন এক অপূর্ব্ব বাঁশি বাজিয়া উঠে, এক অপূর্ব্ব বসন্ত জাগিয়া

উঠে, চরাচর চির যৌবনের আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যায়! যে দিন সমস্ত দুঃখ দারিদ্র্য বিপদকে কিছুই মনে হয় না! নূতন স্বাধীনতার আনন্দে প্রসারিত হৃদয় গোবিন্দমাণিক্যের জীবনে সেই দিন উপস্থিত হইয়াছে।

দক্ষিণ চট্টগ্রামের রামু সহর এখনও দশ ক্রোশ দূরে। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গোবিন্দমাণিক্য যখন আলমখাল নামক ক্ষুদ্র গ্রামে গিয়া পৌঁছিলেন, তখন গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী একটি কুটীর হইতে ক্ষীণকণ্ঠ বালকের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয় সহসা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন—দেখিলেন যুবক কুটীরস্বামী একটি শীর্ণ বালককে কোলে করিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতেছে। বালক থর্থর্ করিয়া কাঁপিতেছে এবং থাকিয়া থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কাঁদিতেছে। কুটীরস্বামী তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ঘুমপাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। সন্যাসবেশী গোবিন্দমাণিক্যকে দেখিয়া সে শশব্যস্ত হইয়া পড়িল। কাতরস্বরে কহিল "ঠাকুর ইহাকে আশীর্ব্বাদ কর।" গোবিন্দমাণিক্য আপনার কম্বল বাহির করিয়া কম্পমান বালকের চারি দিকে জড়াইয়া দিলেন। বালক একবার কেবল তাহার শীর্ণমুখ তুলিয়া গোবিন্দমাণিক্যের দিকে চাহিল। তাহার চোখের নিচে কালি পড়িয়াছে—তাহার ক্ষীণ মুখের মধ্যে দুখানি চোখ ছাড়া আর কিছু নাই

যেন। একবার গোবিন্দমাণিক্যকে দেখিয়াই দুইখানি পাণ্ডুবর্ণ পাৎলা ঠোঁট নাড়িয়া ক্ষীণ অব্যক্ত শব্দ করিল। আবার তখনি তাহার পিতার স্কন্ধের উপর মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার পিতা তাহাকে কম্বল-সমেত ভূমিতে রাখিয়া রাজাকে প্রণাম করিল এবং রাজার পদধূলি লইয়া ছেলের গায়ে মাথায় দিল। রাজা ছেলেকে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন "ছেলেটির বাপের নাম কি?" কুটীর স্বামী কহিল "আমি ইহার বাপ, আমার নাম যাদব। ভগবান্ একে একে আমার সকল কটিকে লইযাছেন, কেবল এইটি এখনো বাকি আছে" বলিয়া গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। রাজা কুটীবস্বামীকে বলিলেন "আজ রাত্রে আমি তোমার এখানে অতিথি। আমি কিছুই খাইব না, অতএব আমার জন্য আহারাদির উদ্যোগ করিতে হইবে না। কেবল এখানে রাত্রিযাপন করিব।" বলিয়া সে রাত্রি সেইখানে রহিলেন। অনুচরগণ গ্রামের এক ধনী কায়স্থের বাড়ি আতিথ্য গ্রহণ করিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। নিকটে একটা পানা পুকুর ছিল, তাহার উপর হইতে বাষ্প উঠিতে লাগিল। গোয়াল ঘর হইতে খড় এবং শুষ্ক পত্র জ্বালানর গুরুভার ধোঁয়া আকাশে উঠিতে পারিল না, গুঁড়িমারিয়া সমুখের বিস্তৃত জলামাঠকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল। আস্‌সেওড়ার বেড়ার কাছ হইতে কর্কশ স্বরে ঝিঁঝিঁ ডাকিতে লাগিল। বাতাস একেবারে

বন্ধ, গাছের পাতাটি নড়িতেছে না। পুকুরের অপর পারে ঘন বাঁশঝাড়ের মধ্য হইতে একটা পাখী থাকিয়া থাকিয়া টিটী করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে। ক্ষীণালোকে গোবিন্দ-মাণিক্য সেই রুগ্ন বালকের বিবর্ণ শীর্ণ মুখ দেখিতেছেন। তিনি তাহাকে ভালরূপ কম্বলে আবৃত করিয়া তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে নানাবিধ গল্প শুনাইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইল, দূরে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। বালক গল্প শুনিতে শুনিতে রোগের কষ্ট ভুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। রাজা তাহার পার্শ্বের ঘরে আসিয়া শয়ন করিলেন। রাত্রে তাঁহার ঘুম হইল না। কেবল ধ্রুবকে মনে পড়িতে লাগিল। রাজা কহিলেন "ধ্রুবকে হারাইয়া সকল বালককেই আমার ধ্রুব বলিয়া বোধ হয়।"

খানিক রাত্রে শুনিলেন পাশের ঘরে ছেলেটি জাগিয়া উঠিয়া তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বাবা ও কি বাজে?"

বাপ কহিল "বাঁশি বাজিতেছে।"

বালক "বাঁশি কেন বাজে?"

বাপ "কাল যে পূজা, বাপ আমার!"

ছেলে "কাল পূজা? পূজার দিন আমাকে কিছু দেবে না?"

বাপ "কি দেবো বাবা?"

ছেলে "আমাকে একটা রাঙা শাল দেবে না?"

বাপ "আমি শাল কোথায় পাব? আমার যে কিছু নেই, মাণিক আমার!"

ছেলে "বাবা, তোমার কিছু নেই বাবা?"

বাপ "কিছু নেই বাবা কেবল তুমি আছ!" ভগ্নহৃদয় পিতার গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পাশের ঘর হইতে শুনা গেল।

ছেলে আর কিছু বলিল না। বোধ করি বাপকে জড়াইয়া ধরিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি শেষ না হইতে হইতেই গোবিন্দমাণিক্য গৃহস্বামীর নিকট বিদায় না লইয়াই অশ্বারোহণে রামু সহরের অভিমুখে চলিয়া গেলেন। আহার করিলেন না, বিশ্রাম করিলেন না। পথের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র নদী ছিল—ঘোড়াসুদ্ধ নদী পার হইলেন। প্রখর রৌদ্রের সময় রামুতে গিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে অধিক বিলম্ব করিলেন না। আবার সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই যাদবের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যাদবকে আড়ালে ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহার ঝুলির মধ্য হইতে একখানি লাল শাল বাহির করিয়া যাদবের হাতে দিয়া কহিলেন "আজ পূজার দিনে এই শালটি তুমি তোমার ছেলেকে দাও।"

যাদব কাঁদিয়া গোবিন্দমাণিক্যের পা জড়াইয়া ধরিল। কহিল "প্রভু তুমি আনিয়াছ, তুমিই দাও।"

রাজা কহিলেন "না আমি দিব না, তুমি দাও। আমি দিলে কোন ফল নাই। আমার নাম করিও না। আমি

কেবল তোমার ছেলের মুখে আনন্দের হাসি দেখিয়া চলিয়া যাইব।”

রুগ্ন বালকের অতি শীর্ণ ম্লান মুখ প্রফুল্ল দেখিয়া রাজা চলিয়া গেলেন। রাজা বিষণ্ণ হইয়া মনে মনে কহিলেন “আমি কোন কাজ করিতে পারি না। আমি কেবল কয়টা বৎসর রাজত্বই করিয়াছি, কিছুই শিক্ষা করি নাই। কি করিলে একটি ক্ষুদ্র বালকের রোগের কষ্ট একটু নিবারণ হইবে তাহা জানি না। আমি কেবল অসহায় অকর্ম্মণ্য ভাবে শোক করিতেই জানি। বিল্বন ঠাকুর যদি থাকিতেন ত ইহাদের কিছু উপকার করিয়া যাইতেন। আমি যদি বিল্বন ঠাকুরের মত হইতাম!”

গোবিন্দমাণিক্য বলিলেন “আমি আর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইব না, লোকালয়ের মধ্যে বাস করিয়া কাজ করিতে শিখিব।”

রামুর দক্ষিণে বাজাকুলের নিকটে মগদিগের যে দুর্গ আছে, আরাকানরাজের অনুমতি লইয়া সেইখানে তিনি বাস করিতে লাগিলেন।

গ্রামবাসীদের যতগুলো ছেলেপিলে ছিল, সকল গুলোই দুর্গে গোবিন্দমাণিক্যের নিকটে আসিয়া জুটিল। গোবিন্দমাণিক্য তাহাদিগকে লইয়া একটা বড় পাঠশালা খুলিলেন। তিনি তাহাদিগকে পড়াইতেন, তাহাদের সহিত খেলিতেন, তাহাদের বাড়িতে গিয়া তাহাদের সহিত বাস করিতেন,

পীড়া হইলে তাহাদিগকে দেখিতে যাইতেন। ছেলেপিলেরা সাধারণতঃ যে নিতান্তই স্বর্গ হইতে আসিয়াছে এবং তাহারা যে দেবশিশু তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে মানব এবং দানব-ভাবের কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই। স্বার্থপরতা ক্রোধ লোভ দ্বেষ হিংসা তাহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ বলবান, তাহার উপরে আবার বাড়িতে পিতামাতার নিকট হইতেও সকল সময়ে ভাল শিক্ষা পায় যে তাহা নহে। এই জন্য মগের দুর্গে মগের রাজত্ব হইয়া উঠিল—দুর্গের মধ্যে যেন উনপঞ্চাশ বায়ু এবং চৌষট্টি ভূতে একত্রে বাসা করিয়াছে। গোবিন্দ-মাণিক্য এই সকল উপকরণ লইয়া ধৈর্য্য ধরিয়া মানুষ গড়িতে লাগিলেন। একটি মানুষের জীবন যে কত মহৎ ও কি প্রাণপণ যত্নে পালন ও রক্ষা করিবার দ্রব্য তাহা গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয় সর্ব্বদা জাগরূক। তাহার চারি-দিকে অনন্ত ফলপরিপূর্ণ মনুষ্যজন্ম সার্থক হয় ইহাই দেখিয়া এবং নিজের চেষ্টায় ইহাই সাধন করিয়া গোবিন্দমাণিক্য নিজের অসম্পূর্ণ জীবন বিসর্জ্জন করিতে চান। ইহার জন্য তিনি সকল কষ্ট ও সকল উপদ্রব সহ্য করিতে পারেন। কেবল মাঝে মাঝে এক একবার হতাশ্বাস হইয়া দুঃখ করি-তেন যে, "আমার কার্য্য আমি নিপুণরূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেছি না। বিল্বন থাকিলে ভাল হইত।"

এইরূপে গোবিন্দমাণিক্য একশত ধ্রুবকে লইয়া দিন-যাপন করিতে লাগিলেন।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে সা সুজা তাঁহার ভ্রাতা ঔরঙ্গীবের সৈন্য কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছেন। এলাহাবাদের নিকটে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার পরাজয় হয়। বিপক্ষ পরাক্রান্ত, এবং এই বিপদের সময় সুজা স্বপক্ষীয়দেরও বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি অপমানিত ও ভীত ভাবে ছদ্মবেশে সামান্য লোকের মত একাকী পলায়ন করিতে লাগিলেন। যেখানেই যান পশ্চাতে শত্রু সৈন্যের ধূলি-ধ্বজা ও তাহাদের অশ্বের ক্ষুরধ্বনি তাঁহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। অবশেষে পাটনায় পৌছিয়া তিনি পুনর্ব্বার নবাববেশে আপন পরিবার ও প্রজাদের নিকটে আগমন সংবাদ ঘোষনা করিলেন। তিনিও যেমন পাটনায় পৌছিয়াছেন, তাহার কিছুকাল পরেই ঔরঙ্গীবের পুত্র কুমার মহম্মদ সৈন্য সহিত পাটনার দ্বারে আসিয়া পৌছিলেন। সুজা পাটনা ছাড়িয়া মুঙ্গেরে পালাইলেন।

মুঙ্গেরে তাঁহার বিক্ষিপ্ত দলবল কতক কতক তাঁহার নিকট আসিয়া জুটিল এবং সেখানে তিনি নূতন সৈন্যও সংগ্রহ করিলেন। তেরিয়াগড়ী ও শিক্‌লিগলীর দুর্গ সংস্কার

* ষ্টুয়ার্ট্-কৃত বাঙ্গলার ইতিহাস হইতে এই পরিচ্ছেদ সংগৃহীত।

করিয়া এবং নদীতীরে পাহাড়ের উপরে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া তিনি দৃঢ় হইয়া বসিলেন।

এদিকে ঔরঙ্গীব তাঁহার বিচক্ষণ সেনাপতি মীর জুম্লাকে কুমার মহম্মদের সাহায্যে পাঠাইলেন। কুমার মহম্মদ প্রকাশ্যভাবে মুঙ্গেরের দুর্গের অনতিদূরে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন, এবং মীরজুম্লা অন্য গোপন পথ দিয়া মুঙ্গেরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যখন সুজা কুমার মহম্মদের সহিত ছোট খাট যুদ্ধে ব্যাপৃত আছেন এমন সময়ে সহসা সংবাদ পাইলেন যে মীরজুম্লা বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া বসন্তপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সুজা ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমস্ত সৈন্য লইয়া মুঙ্গের ছাড়িয়া রাজমহলে পলায়ন করিলেন। সেইখানেই তাঁহার সমস্ত পরিবার বাস করিতেছিল। সম্রাট সৈন্য অবিলম্বে সেখানেও তাঁহার অনুসরণ করিল। সুজা ছয়দিন ধরিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া শত্রু সৈন্যকে অগ্রসর হইতে দিলেন না। কিন্তু যখন দেখিলেন আর রক্ষা হয় না, তখন একদিন অন্ধকার ঝড়ের রাত্রে তাঁহার পরিবার সকল ও যথা সম্ভব ধন সম্পত্তি লইয়া নদীপার হইয়া তোণ্ডায় পলায়ন করিলেন এবং অবিলম্বে সেখানকার দুর্গ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে ঘন বর্ষা আসিল, নদী অত্যন্ত স্ফীত এবং পথ দুর্গম হইয়া উঠিল। সম্রাট সৈন্যেরা অগ্রসর হইতে পারিল না।

এই যুদ্ধ বিগ্রহের পূর্ব্বে কুমার মহম্মদের সহিত সুজার কন্যার বিবাহের সমস্ত স্থির হইয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধের উপদ্রবে সে প্রস্তাব উভয় পক্ষই বিস্মৃত হইয়াছিল।

বর্ষায় যখন যুদ্ধ স্থগিত আছে, এবং মীরজুম্লা রাজমহল হইতে কিছুদূরে তাঁহার শিবির লইয়া গেছেন, এমন সময় সুজার একজন সৈনিক তোণ্ডার শিবির হইতে আসিয়া গোপনে কুমার মহম্মদের হস্তে একখানি পত্র দিল। কুমার খুলিয়া দেখিলেন সুজার কন্যা লিখিতেছেন ' "কুমার, এই কি আমার অদৃষ্টে ছিল! যাঁহাকে মনে মনে স্বামী রূপে বরণ করিয়া আমার সমগ্র হৃদয় সমর্পণ করিয়াছি, যিনি অঙ্গুরীয় বিনিময় করিয়া আমাকে গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন—তিনি আজ নিষ্ঠুর তরবারী হস্তে আমার পিতার প্রাণ লইতে আসিয়াছেন এই কি আমাকে দেখিতে হইল। কুমার, এই কি আমাদের বিবাহ উৎসব! তাই কি এত সমারোহ! তাই কি আমাদের রাজমহল আজ রক্ত বর্ণ! তাই কি, কুমার, দিল্লি হইতে লোহার শৃঙ্খল হাতে করিয়া অনিয়াছেন! এই কি প্রেমের শৃঙ্খল!"

এই পত্র পড়িয়া সহসা প্রবল ভূমিকম্পে যেন কুমার মহম্মদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি এক মুহূর্ত্ত আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ সাম্রাজ্যের আশা, বাদশাহের অনুগ্রহ - সমস্ত তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন।

প্রথম যৌবনের দীপ্ত হুতাশনে তিনি ক্ষতি লাভের বিবেচনা সমস্ত বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার পিতার সমস্ত কার্য্য তাঁহার অত্যন্ত অন্যায় ও নিষ্ঠুর বলিয়া বোধ হইল। পিতার ষড়যন্ত্রপ্রবণ নিষ্ঠুর নীতির বিরুদ্ধে ইতিপূর্ব্বে তিনি পিতার সমক্ষেই আপন মত স্পষ্ট ব্যক্ত করিতেন, এবং কখন কখন তিনি সম্রাটের বিরাগভাজন হইতেন। আজ তিনি তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে ডাকিয়া সম্রাটের নিষ্ঠুরতা খলতা ও অত্যাচার সম্বন্ধে বিরাগ প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"আমি তোগুায় আমার পিতৃব্যের সহিত যোগ দিতে যাইব। তোমরা যাহারা আমাকে ভালবাস আমার অনুবর্ত্তী হও।" তাহারা দীর্ঘ সেলাম করিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল "সাহজাদা যাহা বলিতেছেন তাহা অতি যথার্থ, কালই দেখিবেন অর্দ্ধেক সৈন্য তোগুার শিবিরে সাহজাদার সহিত মিলিত হইবে।" মহম্মদ সেই দিনই নদী পার হইয়া সুজার শিবিরে উপস্থিত হইলেন।

তোগুায় উৎসব পড়িয়া গেল। যুদ্ধ বিগ্রহের কথা সকলে একেবারেই ভুলিয়া গেল। এতদিন কেবল পুরুষেরাই ব্যস্ত ছিল, এখন সুজার পরিবারে রমণীদের হাতে কাজের আর অন্ত রহিল না। সুজা অত্যন্ত স্নেহ ও আনন্দের সহিত মহম্মদকে গ্রহণ করিলেন। অবিশ্রাম রক্তপাতের পরে রক্তের টান যেন আরও বাড়িয়া উঠিল।

নৃত্যগীত বাদ্যের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। নৃত্য-গীত শেষ হইতে না হইতেই সংবাদ আসিল সম্রাট সৈন্য নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

মহম্মদ যেম্নি সুজার শিবিরে গেছেন, সৈন্যেরা অম্নি মীরজুম্লার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল। একটি সৈন্যও মহম্মদের সহিত যোগ দিল না, তাহারা বুঝিয়াছিল মহম্মদ ইচ্ছাপূর্ব্বক বিপদসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন, সেখানে তাঁহার দলভুক্ত হইতে যাওয়া বাতুলতা।

সুজা এবং মহম্মদের বিশ্বাস ছিল যে সম্রাট্ সৈন্যের অধিকাংশই যুদ্ধক্ষেত্রে কুমার মহম্মদের সহিত যোগ দিবে। এই আশায় মহম্মদ নিজের নিশান উড়াইয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বৃহৎ একদল সম্রাট্ সৈন্য তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল। মহম্মদ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। নিকটে আসিয়াই তাহারা মহম্মদের সৈন্য-দলের উপরে গোলা বর্ষণ করিল। তখন মহম্মদ সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তখন আর সময় নাই। সৈন্যেরা পলায়ন-তৎপর হইল। সুজার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুদ্ধে মারা পড়িল।

সেই রাত্রেই হতভাগ্য সুজা এবং তাঁহার জামাতা সপ-রিবারে দ্রুতগামী নৌকায় চড়িয়া ঢাকায় পলায়ন করি-লেন। জুম্লা ঢাকায় সুজার অনুসরণ করা আবশ্যক বিবে-চনা করিলেন না। তিনি বিজিত দেশে শৃঙ্খলা স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন।

দুর্দ্দশার দিনে বিপদের সময় যখন বন্ধুরা একে একে বিমুখ হইতে থাকে তখন মহম্মদ ধন প্রাণ মান তুচ্ছ করিয়া সুজার পক্ষাবলম্বন করাতে সুজার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি প্রাণের সহিত মহম্মদকে ভাল বাসি-লেন। এমন সময়ে ঢাকা সহরে ঔরঙ্গীবের একজন পত্র-বাহক চর ধরা পড়িল। সুজার হাতে তাহার পত্র গিয়া পড়িল। ঔরঙ্গীব মহম্মদকে লিখিতেছেন "প্রিয়তম পুত্র মহম্মদ, তুমি তোমার কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া পিতৃ-বিদ্রোহী হইয়াছ, এবং তোমার অকলঙ্ক যশে কলঙ্ক নিক্ষেপ করিয়াছ। রমণীর ছলনাময় হাস্যে মুগ্ধ হইয়া আপন ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছ। ভবিষ্যতে সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য শাসনের ভার যাঁহার হস্তে, তিনি আজ এক রমণীর দাস হইয়া আছেন। যাহা হউক্ ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া মহম্মদ যখন অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে মাপ করিলাম। কিন্তু যে কার্য্যের জন্য গিয়াছেন সেই কার্য্য সাধন করিয়া আসিলে তবে তিনি আমাদের অনু-গ্রহের অধিকারী হইবেন!"

সুজা এই পত্র পাঠ করিয়া বজ্রাহত হইলেন। মহম্মদ বার বার করিয়া বলিলেন তিনি কখনই পিতার নিকটে অনুতাপ প্রকাশ করেন নাই। এ সমস্তই তাঁহার পিতার কৌশল। কিন্তু সুজার সন্দেহ দূর হইল না। সুজা তিন দিন ধরিয়া চিন্তা করিলেন অবশেষে চতুর্থ দিনে কহিলেন

"বৎস, আমাদের মধ্যে বিশ্বাসের বন্ধন শিথিল হইয়াছে। অতএব আমি অনুরোধ করিতেছি তুমি তোমার স্ত্রীকে লইয়া প্রস্থান কর, নহিলে আমাদের মনে আর শান্তি থাকিবে না। আমার রাজকোষের দ্বার মুক্ত করিয়া দিলাম, শ্বশুরের উপহার স্বরূপ যত ইচ্ছা ধনরত্ন লইয়া যাও।"

মহম্মদ অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া বিদায় হইলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সঙ্গে গেলেন।

সুজা কহিলেন "আর যুদ্ধ করিব না। চট্টগ্রামের বন্দর হইতে জাহাজ লইয়া মক্কায় চলিয়া যাইব।" বলিয়া ঢাকা ছাড়িয়া ছদ্মবেশে চলিয়া গেলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

যে দুর্গে গোবিন্দমাণিক্য বাস করিতেন, একদিন বর্ষার অপরাহ্নে সেই দুর্গের পথে একজন ফকীর সঙ্গে তিন বালক ও একজন প্রাপ্তবয়স্ক তল্পীদার লইয়া চলিয়াছেন। বালকদের অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাইতেছে। বাতাস বেগে বহিতেছে এবং অবিশ্রাম বর্ষার ধারা পড়িতেছে। সকলের চেয়ে ছোট বালকটির বয়স চৌদ্দর অধিক হইবে না, সে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে কাতরস্বরে কহিল "পিতা, আর ত পারি না।" বলিয়া অধীরভাবে কাঁদিতে লাগিল। ফকীর কিছু না বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। বড় বালকটি ছোটকে তিরস্কার করিয়া

কহিল 'পথের মধ্যে এমন করিয়া কাঁদিয়া ফল কি? চুপ্ কর্! অনর্থক পিতাকে কাতর করিস্ নে!" ছোট বালকটি তখন তাহার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন দমন করিয়া শান্ত হইল। মধ্যম বালকটি ফকীরকে জিজ্ঞাসা করিল "পিতা আমরা কোথায় যাইতেছি!"

ফকীর কহিলেন "ঐ যে দুর্গের চূড়া দেখা যাইতেছে ঐ দুর্গে যাইতেছি!"

"ওখেনে কে আছে পিতা?"

"শুনিয়াছি কোথাকার একজন রাজা সন্যাসী হইয়া ওখানে বাস করেন!"

"রাজা সন্যাসী কেন হইল পিতা!"

ফকীর কহিলেন "জানি না বাছা। হয়ত তাঁহার আপনার সহোদর ভ্রাতা সৈন্য লইয়া তাঁহাকে একটা গ্রাম্য কুকুরের মত দেশ হইতে দেশান্তরে তাড়া করিয়াছে। রাজ্য ও সুখ সম্পৎ হইতে তাঁহাকে পথে বাহির করিয়া দিয়াছে। এখন হয়ত কেবল দারিদ্র্যের অন্ধকার ক্ষুদ্র গহ্বর ও সন্যাসীর গেরুয়া বসন পৃথিবীর মধ্যে তাঁহার এক মাত্র লুকাইবার স্থান। আপনার ভ্রাতার বিদ্বেষ হইতে বিষদন্ত হইতে আর কোথাও রক্ষা নাই!"

বলিয়া ফকীর দৃঢ়রূপে আপন ওষ্ঠাধর চাপিয়া হৃদয়ের আবেগ দমন করিলেন। বড় ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল "পিতা, এই সন্যাসী কোন্ দেশের রাজা ছিল।"

ফকীর কহিলেন "তাহা জানি না বাছা।"

"যদি আমাদের আশ্রয় না দেয়।"

"তবে আমরা বৃক্ষতলে শয়ন করিব। আর আমাদের স্থান কোথায়!"

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে দুর্গে সন্যাসী ও ফকিরে দেখা হইল। উভয়েই উভয়কে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। গোবিন্দ-মাণিক্য চাহিয়া দেখিলেন ফকিরকে ফকির বলিয়া বোধ হইল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থপর বাসনা হইতে হৃদয়কে প্রত্যা-হরণ করিয়া একমাত্র বৃহৎ উদ্দেশ্যের মধ্যে স্থাপন করিলে মুখে যে একপ্রকার জ্বালাবিহীন বিমল জ্যোতি প্রকাশ পায় ফকিরের মুখে তাহা দেখিতে পাইলেন না। ফকির সর্ব্বদা সতর্কিত সচকিত। তাঁহার হৃদয়ের তৃষিত বাসনা সকল তাঁহার দুই জ্বলন্ত নেত্র হইতে যেন অগ্নি পান করিতেছে। অধীর হিংসা তাঁহার দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর এবং দৃঢ়লগ্ন দন্তের মধ্যে বিফলে প্রতিহত হইয়া পুনরায় যেন হৃদয়ের অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করিয়া আপনাকে আপনি দংশন করিতেছে। সঙ্গে তিন জন বালক, তাহাদের অত্যন্ত সুকুমার সুন্দর শ্রান্ত ক্লিষ্ট দেহ ও একপ্রকার গর্ব্বিত সঙ্কোচ দেখিয়া মনে হইল যেন তাহারা আজন্মকাল অতি সযত্নে সম্মানের শিকার উপরে তোলা ছিল এই প্রথম তাহাদের ভূমিতলে পদার্পণ। চলিতে গেলে যে চরণের অঙ্গুলিতে ধূলি লাগে ইহা যেন পূর্ব্বে তাহাদের প্রত্যক্ষ

জানা ছিল না। পৃথিবীর এই ধূলিময় মলিন দারিদ্র্যে প্রতিপদে যেন পৃথিবীর উপরে তাহাদের ঘৃণা জন্মিতেছে। মছলন্দ ও মাটির প্রভেদ দেখিয়া প্রতিপদে তাহারা যেন পৃথিবীকে তিরস্কার করিতেছে। পৃথিবী যেন তাহাদেরই প্রতি বিশেষ আড়ি করিয়া আপনার বড় মছলন্দখানা গুটাইয়া রাখিয়াছে। সকলেই যেন তাহাদের নিকটে অপরাধ করিতেছে। দরিদ্র যে ভিক্ষা করিবার জন্য তাহার মলিন বসন লইয়া তাঁহাদের কাছে ঘেঁসিতে সাহস করিতেছে এ কেবল তাহার স্পর্দ্ধা—ঘৃণ্য কুকুর পাছে কাছে আসে এই জন্য লোকে যেমন খাদ্যখণ্ড দূর হইতে ছুঁড়িয়া দেয়, ইহারাও যেন তেমনি ক্ষুধার্ত্ত মলিন ভিক্ষুককে দেখিলে দূর হইতে মুখ ফিরাইয়া একমুঠা মুদ্রা অনায়াসে ফেলিয়া দিতে পারে। তাহাদের চক্ষে অধিকাংশ পৃথিবীর একপ্রকার যৎসামান্য ভাব ও ছিন্নবস্ত্র অকিঞ্চনতা যেন কেবল একটা মস্ত বেয়াদবি। তাহারা যে পৃথিবীতে সুখী ও সম্মানিত হইতেছে না এ কেবল পৃথিবীর দোষ। গোবিন্দমাণিক্য যে ঠিক এতটা ভাবিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি লক্ষণ দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন, যে, এই ফকির, এ যে আপনার বাসনা সকল বিসর্জ্জন দিয়া স্বাধীন ও সুস্থ হইয়া জগতের কাজ করিতে বাহির হইয়াছে তাহা নহে, এ কেবল আপনার বাসনা তৃপ্ত হয় নাই বলিয়া রাগ করিয়া সমস্ত জগতের প্রতি বিমুখ হইয়া বাহির হইয়াছে। তিনি যাহা

চান তাহাই তাঁহার পাওনা এইরূপ ফকিরের বিশ্বাস, এবং জগৎ তাঁহার নিকটে যাহা চায় তাহা সুবিধামত দিলেই চলিবে এবং না দিলেও কোন ক্ষতি নাই। ঠিক এই বিশ্বাস-অনুসারে কাজ হয় নাই বলিয়া তিনি জগৎকে একঘোরে করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন।

গোবিন্দমানিক্যকে দেখিয়া ফকিরের রাজা বলিয়াও মনে হইল সন্যাসী বলিয়াও বোধ হইল। তিনি ঠিক এরূপ আশা করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন হয় একটা লম্বোদর পাগড়ীপরা স্ফীত মাংসপিণ্ড দেখিবেন নয় ত একটা দীনবেশধারী মলিন সন্যাসী অর্থাৎ ভস্মাছাদিত ধূলিশয্যাশায়ী উদ্ধত স্পর্দ্ধা দেখিতে পাইবেন। কিন্তু দুয়ের মধ্যে কোনটাই দেখিতে পাইলেন না। গোবিন্দ-মাণিক্যকে দেখিয়া বোধ হইল তিনি যেন সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন, তবু যেন সমস্তই তাঁহারই। তিনি কিছুই চান না বলিয়াই যেন পাইয়াছেন—তিনি আপনাকে দিয়াছেন বলিয়া পাইয়াছেন। তিনি যেমন আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তেমনি সমস্ত জগৎ আপন ইচ্ছায় তাঁহার নিকটে ধরা দিয়াছে। কোন প্রকার আড়ম্বর নাই বলিয়া তিনি রাজা, এবং সমস্ত সংসারের নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন বলিয়া তিনি সন্যাসী। এই জন্য তাঁহাকে রাজাও সাজিতে হয় নাই, সন্যাসীও সাজিতে হয় নাই।

রাজা তাঁহার অতিথিদিগকে সযত্নে সেবা করিলেন।

তাঁহারা তাঁহার সেবা পরম অবহেলার সহিত গ্রহণ করিলেন। ইহাতে যেন তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। তাঁহাদের আরামের জন্য কি কি দ্রব্য আবশ্যক তাহাও রাজাকে জানাইয়া দিলেন। রাজা বড় ছেলেটিকে স্নেহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "পথশ্রমে অত্যন্ত শ্রান্তিবোধ হইয়াছে কি ?"

বালক তাহার ভালরূপ উত্তর না দিয়া ফকিরের কাছে ঘেঁসিয়া বসিল। রাজা তাহাদের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "তোমাদের এই সুকুমার শরীর ত পথে চলিবার জন্য নহে। তোমরা আমার এই দুর্গে বাস কর আমি তোমাদিগকে যত্ন করিয়া রাখিব।"

রাজার এই কথার উত্তর দেওয়া উচিত কি না এবং এই সকল লোকদের সহিত ঠিক কিরূপ ভাবে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা বালকেরা ভাবিয়া পাইল না--তাহারা ফকিরের অধিকতর কাছে ঘেঁসিয়া বসিল, যেন মনে করিল কোথাকার এই ব্যক্তি মলিন হাত বাড়াইয়া তাহাদিগকে এখনই আত্মসাৎ করিতে আসিতেছে।

ফকির গম্ভীর হইয়া বলিলেন "আচ্ছা, আমরা কিছুকাল তোমার এই দুর্গে বাস করিতে পারি।" রাজাকে যেন অনুগ্রহ করিলেন। মনে মনে কহিলেন "আমি কে তাহা যদি জানিতে তবে এই অনুগ্রহে তোমার আর আনন্দের সীমা থাকিত না!"

তিনটি বালককে রাজা কিছুতেই পোষ মানাইতে পারিলেন না। এবং ফকির নিতান্ত যেন নির্লিপ্ত হইয়া রহিলেন।

ফকির গোবিন্দমাণিক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "শুনিয়াছি তুমি এককালে রাজা ছিলে; কোথাকার রাজা?"

গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন "ত্রিপুরার।"

শুনিয়া বালকেরা তাঁহাকে অত্যন্ত ছোট বিবেচনা করিল। তাহারা কোন কালে ত্রিপুরার নাম শুনে নাই। কিন্তু ফকির ঈষৎ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার রাজত্ব গেল কি করিয়া?"

গোবিন্দমাণিক্য কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন "বাঙ্গলার নবাব শা সুজা আমাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছেন।" নক্ষত্ররায়ের কোন কথা বলিলেন না।

এই কথা শুনিয়া বালকেরা সকলে চমকিয়া উঠিয়া ফকিরের মুখের দিকে চাহিল ফকিরের মুখ যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি সহসা বলিয়া ফেলিলেন "এ সকল বুঝি তোমার ভাইয়ের কাজ! তোমার ভাই বুঝি তোমাকে রাজ্য হইতে তাড়া করিয়া সন্যাসী করিয়াছে!"

রাজা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন কহিলেন "তুমি এত সংবাদ কোথায় পাইলে সাহেব!" পরে মনে করিলেন "আশ্চ-

ফকির কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। রাজা তাঁহার অতিথিকে প্রণাম করিলেন। অতিথি আর কেহ নহেন, রঘুপতি। রঘুপতি রাজার প্রণাম গ্রহণ করিয়া কহিলেন "জয় হোক্!"

রাজা কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "নক্ষত্রের নিকট হইতে আসিতেছ ঠাকুর? বিশেষ কোন সংবাদ আছে?"

রঘুপতি কহিলেন "নক্ষত্ররায় ভাল আছেন তাঁহার জন্য ভাবিবেন না।" আকাশের দিকে হাত তুলিয়া কহিলেন "আমাকে জয়সিংহ তোমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছে। সে বাঁচিয়া নাই। তাহার ইচ্ছা আমি সাধন করিব নহিলে আমার শান্তি নাই। তোমার কাছে থাকিয়া তোমার সঙ্গী হইয়া তোমার সকল কার্য্যে আমি যোগ দিব।"

রাজা প্রথমে রঘুপতির ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি একবার মনে করিলেন—রঘুপতি বুঝি পাগল হইয়া থাকিবেন। রাজা চুপ করিয়া রহিলেন।

রঘুপতি কহিলেন "আমি সমস্ত দেখিয়াছি কিছুতেই সুখ নাই। হিংসা করিয়া সুখ নাই, আধিপত্য করিয়া সুখ নাই, তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছ তাহাতেই সুখ। আমি তোমার পরম শত্রুতা করিয়াছি, আমি তোমাকে হিংসা করিয়াছি, তোমাকে আমার কাছে বলি দিতে চাহিয়াছিলাম, আজ আমাকে তোমার কাছে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে আসিয়াছি!"

গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন "ঠাকুর তুমি আমার পরম উপকার করিয়াছ, আমার শত্রু আমার ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গেই লিপ্ত হইয়া ছিল, তাহার হাত হইতে তুমি আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছ।"

রঘুপতি সে কথায় বড় একটা কান না দিয়া কহিলেন "মহারাজ, আমি জগতের রক্তপাত করিয়া যে পিশাচীকে এতকাল সেবা করিয়া আসিয়াছি, সে অবশেষে আমারই হৃদয়ের সমস্ত রক্ত শোষণ করিয়া পান করিয়াছে। সেই শোণিতপিপাসী জড়তা মূঢ়তাকে আমি দূর করিয়া আসিয়াছি সে এখন মহারাজের রাজ্যের দেবমন্দিরে নাই, এখন সে রাজসভায় প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে চড়িয়া বসিয়াছে।"

রাজা কহিলেন "দেব মন্দির হইতে যদি সে দূর হয় ত ক্রমে মানবের হৃদয় হইতেও দুর হইতে পারিবে।"

পশ্চাৎ হইতে একটী পরিচিত স্বর কহিল "না মহারাজ, মানব হৃদয়ই প্রকৃত মন্দির, সেইখানেই খড়্গ শাণিত হয় এবং সেইখানেই শত সহস্র নরবলি হয়। দেবমন্দিরে তাহার সামান্য অভিনয় হয় মাত্র!"

রাজা সচকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন সহাস্য সৌম্যমূর্ত্তি বিল্বন। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন "আজ আমার কি আনন্দ!"

বিল্বন কহিলেন "মহারাজ আপনাকে জয় করিয়াছেন

খলিয়া সকলকেই জয় করিয়াছেন। তাই আজ আপনার দ্বারে শক্রমিত্র সকলে একত্র হইয়াছে।”

ফকির অগ্রসর হইয়া কহিলেন “মহারাজ, আমিও তোমার শক্র আমিও তোমার হাতে ধরা দিলাম।” রঘুপতির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন “এই ব্রাহ্মণ ঠাকুর আমাকে জানেন। আমিই সুজা, বাঙ্গলার নবাব, আমিই তোমাকে বিনাপরাধে নির্ব্বাসিত করিয়াছি এব সে পাপের শাস্তিও পাইয়াছি—আমার ভ্রাতার হিংসা আজ পথে পথে আমার অনুসরণ করিতেছে, আমার রাজ্যে আমার আর দাঁড়াইবার স্থান নাই। ছদ্মবেশে আমি আর থাকিতে পারি না, তোমার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া আমি বাঁচিলাম।”

তখন রাজা ও নবাব উভয়ে কোলাকুলি করিলেন রাজা কেবলমাত্র কহিলেন “আমার কি সৌভাগ্য!”

রঘুপতি কহিলেন “মহারাজ, তোমার সহিত শক্রতা করিলেও লাভ আছে। তোমার শক্রতা করিতে গিয়াই তোমার কাছে ধরা পড়িয়াছি, নহিলে কোন কালে তোমাকে জানিতাম না।”

বিল্বন হাসিয়া কহিলেন “যেমন ফাঁসের মধ্যে পড়িয়া ফাঁস ছিড়িতে গিয়া গলায় আরও অধিক বাধিয়া যায়!”

রঘুপতি কহিলেন “আমার আর দুঃখ নাই—আমি শান্তি পাইয়াছি।”

বিল্বন কহিলেন "শান্তি সুখ আপনার মধ্যেই আছে, কেবল জানিতে পাই না। ভগবান এ যেন মাটির হাঁড়িতে অমৃত রাখিয়াছেন, অমৃত আছে বলিয়া কাহারও বিশ্বাস হয় না। আঘাত লাগিয়া হাঁড়ি ভাঙ্গিলে তবে অনেক সময়ে সুধার আস্বাদ পাই। হায় হায়, এমন জিনিষও এমন জায়গায় থাকে!"

এমন সময়ে একটা অভ্রভেদী হো হা শব্দ উঠিল। দেখিতে দেখিতে দুর্গের মধ্যে ছোট বড় নানাবিধ ছেলে আসিয়া পড়িল। রাজা বিল্বনকে কহিলেন "এই দেখ ঠাকুর আমার ধ্রুব।" বলিয়া ছেলেদের দেখাইয়া দিলেন।

বিল্বন কহিলেন "যাহার প্রসাদে তুমি এতগুলি ছেলে পাইয়াছ সেও তোমাকে ভোলে নাই, তাহাকেও আনিয়া দিই।" বলিয়া বাহিরে গেলেন। কিঞ্চিৎ বিলম্বে ধ্রুবকে কোলে করিয়া রাজার কোলে দিলেন।

রাজা তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ডাকিলেন "ধ্রুব।"

ধ্রুব কিছুই বলিল না, গম্ভীর ভাবে নীরবে রাজার কাঁধে মাথা দিয়া পড়িয়া রহিল। বহুদিন পরে প্রথম মিলনে বালকের ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে যেন এক প্রকার অস্ফুট অভিমান ও লজ্জার উদয় হইল। রাজাকে জড়াইয়া মুখ লুকাইয়া রহিল।

রাজা বলিলেন "আর সব হইল, কেবল নক্ষত্র আমাকে ভাই বলিল না।"

সুজা তীব্রভাবে কহিলেন "মহারাজ, আর সকলেই অতি সহজেই ভাইয়ের মত ব্যবহার করে কেবল নিজের ভাই করে না।"

সুজার হৃদয় হইতে এখনও শেল উৎপাটিত হয় নাই।

উপসংহার।

এইখানে বলা আবশ্যক তিনটি বালক সুজার তিন ছদ্মবেশী কন্যা। সুজা মক্কা যাইবার উদ্দেশে চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গুরুতর বর্ষার প্রাদুর্ভাবে একখানিও জাহাজ পাইলেন না। অবশেষে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবার পথে গোবিন্দমাণিক্যের সহিত দুর্গে দেখা হয়।

কিছুদিন দুর্গে বাস করিয়া সুজা সংবাদ পাইলেন এখনও সম্রাট সৈন্য তাঁহাকে সন্ধান করিতেছে। গোবিন্দমাণিক্য যানাদি ও বিস্তর অনুচর সমেত তাঁহার বন্ধু আরাকানপতির নিকটে তাঁহাকে প্রেরণ করেন। যাইবার সময় সুজা তাঁহাকে বহুমূল্য তরবারি উপহার স্বরূপ দান করেন।

ইতিমধ্যে রাজা, রঘুপতি ও বিল্বনে মিলিয়া সমস্ত গ্রামকে যেন সচেতন করিয়া তুলিলেন। রাজার দুর্গ সমস্ত গ্রামের প্রাণ হইয়া উঠিল।

এইরূপে ছয় বৎসর কাটিয়া গেলে ছত্র মাণিক্যের মৃত্যু হইল। গোবিন্দমাণিক্যকে সিংহাসনে ফিরাইয়া লইবার জন্য ত্রিপুরা হইতে দূত আসিল।

গোবিন্দমাণিক্য প্রথমে বলিলেন "আমি রাজ্যে ফিরিব না।"

বিল্বন কহিলেন "সে হইবে না মহারাজ। ধর্ম্ম যখন স্বয়ং দ্বারে আসিয়া আহ্বান করিতেছেন তখন তাঁহাকে অবহেলা করিবেন না।"

রাজা তাঁহার ছাত্রদের দিকে চাহিয়া কহিলেন "আমার এতদিনকার আশা অসমাপ্ত এতদিনকার কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিবে ?"

বিল্বন কহিলেন "এখানে তোমার কার্য্য আমি করিব।"

রাজা কহিলেন "তুমি যদি এখানে থাক তাহা হইলে আমার সেখানকার কার্য্য অসম্পূর্ণ হইবে।"

বিল্বন কহিলেন "না মহারাজ, এখন আমাকে আর তোমার আবশ্যক নাই। তুমি এখন আপনার প্রতি আপনি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পার। আমি যদি সময় পাই ত মাঝে মাঝে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব।"

রাজা ধ্রুবকে সঙ্গে লইয়া রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। ধ্রুব এখন আর নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। সে বিল্বনের প্রসাদে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া শাস্ত্র অধ্যয়নে মন দিয়াছে। রঘুপতি পুনর্ব্বার পৌরোহিত্য গ্রহণ করিলেন। এবার মন্দিরে আসিয়া যেন মৃত জয়সিংহকে পুনর্ব্বার জীবিতভাবে প্রাপ্ত হইলেন।

এদিকে বিশ্বাস ঘাতক আরাকানপতি সুজাকে হত্যা করিয়া তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ কন্যাকে বিবাহ করেন।

"দুর্ভাগা সুজার প্রতি আরাকানপতির নৃশংসতা স্মরণ করিয়া গোবিন্দমাণিক্য দুঃখ করিতেন। সুজার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি তরবারের বিনিময়ে বহুতর অর্থ দ্বারা কুমিল্লা নগরীতে একটি উৎকৃষ্ট মস্‌জিদ্ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহা অদ্যাপি সুজামস্‌জিদ্ বলিযা বর্ত্তমান আছে।

গোবিন্দমাণিক্যের যত্নে মেহেরকুল আবাদ হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণগণকে বিস্তর ভূমি তাম্রপত্রে সনন্দ লিখিয়া দান করেন। মহারাজ গোবিন্দ কুমিল্লার দক্ষিণে বাতিসা গ্রামে একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। তিনি অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, কিন্তু সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। এই জন্য অনুতাপ করিয়া ১৬৬৯ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।" *

সমাপ্ত।

---

* শেষ দুই পারাগ্রাফ শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত ত্রিপুরার ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত।

পরিশিষ্ট।

ত্রিপুরার বর্ত্তমান মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত ইতিহাস আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। পরিশিষ্ট স্বরূপে তাহা এস্থলে প্রকাশিত হইল।

মহারাজগোবিন্দমাণিক্যস্য

চরিতম্।

কল্যাণমাণিক্যস্য মরণাৎ ষোড়শদিনে বুধবাসরে শুভতিথ্যাদিযুতে যুবরাজো গোবিন্দনারায়ণো নানাবিধমহোৎসবৈঃ স্বকুলাচারবিধিনা সিংহাসনমারুহ্য পূর্ব্বরীত্যৈকপৃষ্ঠে শিবলিঙ্গাকৃতিখচিতামপরপৃষ্ঠে স্বমহিষীগুণবতীনামাঙ্কিতাং স্বুবর্ণময়ীং রজতময়ীঞ্চ মুদ্রাং প্রথমমেব প্রচারয়ামাস। ততোঽমাত্যাদয়ঃ সর্ব্বে যথাবিধি রাজোপহারং প্রদদুঃ। ভূপালোঽপি সমাগতান্ ব্রাহ্মণান্ ভিক্ষুকাদিংশ্চ ভোজ্যদানাদিভিঃ পরিতুতোষ। অথ তস্য রাজ্যাভিষেকাদীর্ষাপরতন্ত্রস্তৎবৈমাত্রেয়ো নক্ষত্রঠাকুরো মুর্শিদাবাদাবস্থিতনবাবান্তিকং গত্বা স্বপরিচয়ং বিজ্ঞাপয়ামাস। সোঽপি ত্রিপুররাজপুত্রোঽয়মিতি সমাদৃত্য তং যথোপচারং স্বনগর্য্যাং স্থাপয়ামাস। নক্ষত্রঠাকুরস্তু প্রত্যহং নানাবিধকৌতুকবাক্যেন নবাবং পরিতোষিতবান্। ততঃ ক্রমেণোভয়োঃ সৌহৃদ্যে সঞ্জাতে

কদাচিৎ নক্ষত্রঠাকুরো নবাবং স্বাভিলষিতং বিজ্ঞাপ্য "যদ্যহং ত্বৎসাহায্যতঃ স্বপিতৃরাজ্যং লপ্স্যে তদা প্রচুরং হস্ত্যাদ্যুপহারং তে দাস্যামীতি প্রোবাচ।" তদাকর্ণ্য নবাবঃ "বহুশোহি ত্রিপুররাজ্যমধিকর্ত্তুং কৃতযত্নোহপি পূর্ণমনোরথো নোহভবম্। পুনরিদানীং যদ্যেষামাত্মবিরোধঃ সঞ্জায়তে, তদানায়াসেনৈব তদ্রাজ্যং লপ্স্য ইতি" স্বাত্মনি বিচিন্ত্য তস্মৈ মহাবলপরাক্রান্তান্ সৈনিকান্ দত্ত্বা বিগ্রহৈঃ স্বরাজ্যলাভায় স্বদেশং গন্তমাজ্ঞাপয়ৎ। সোহপি তদাজ্ঞপ্তঃ স্বসৈন্যস্তস্মাৎ প্রস্থায় উদয়পুররাজধানীসমীপমাগতঃ। তদাকর্ণ্য ত্রৈপুরাঃ সর্ব্ব এব যুদ্ধোদ্যোগায় ভূপতিং পুনঃ পুনর্নিবেদিতবন্তঃ। সুধীরো ভূপালস্তদাকর্ণ্য "ক্ষণভঙ্গুররাজ্যসুখভোগায় ভ্রাত্রা চিরমকীর্ত্তিকরং যুদ্ধং কদাপ্যহং ন করিষ্যামি, ঈদৃশং রাজ্যভোগমপেক্ষ্য বনগমনমেব শ্রেয়ঃ" ইত্যাদি নীতিবচনৈ স্তান্ প্রবোধ্য সত্বরং স্বমহিষ্যা গুণবত্যা ভ্রাত্রাদিভিশ্চ সহ রিয়াংদেশং গত্বা তত্রৈকাং পুরীং নির্ম্মায়োবাস। তত্রত্যা রিয়াংগণাস্তং ত্রিপুরেশং স্বজনমিব সংমেনিরে।

অত্রান্তরে কতি দিনং ছত্রমাণিক্যস্য রাজ্যাধিকারঃ, তস্মিন্ মৃতে পুনর্গোবিন্দমাণিক্য এব রাজা বভুব।

অথ রিয়াংরাজ্যাবস্থিতং গোবিন্দমাণিক্যং প্রতি তে রিয়াংগণাঃ ক্রমশো বৈরক্তিং প্রকাশয়ামাসুঃ। স চ তেষা-

মীদৃশাচরণং দৃষ্ট্বা স্বরাজ্ঞীং সোদরং জগদ্বন্ধুঠাকুরং সূর্য্য-প্রতাপনারায়ণচম্পকনারায়ণরাজকুমারাভিধানান্ ভ্রাতৃপুত্রাংশ্চ গৃহীত্বা তস্মাৎ চট্টলদেশাভিমুখং জগাম। পথি জগদ্বন্ধু-ঠাকুরাত্মজো রাজকুমারঃ পিত্রা পুনঃপুনর্নিষিদ্ধোঽপি স্বদেশং গন্তুমুপচক্রমে। তেন ধৃষ্টাচরণেনাতিক্রুদ্ধো জগদ্বন্ধুঠাকুরশ্চ তস্য শিরশ্ছিত্বানয়নায় জামাতরমাজ্ঞাপয়ৎ। স কিয়দ্দূরে রাজকুমারমুপগম্য তং প্রতিনিবর্ত্তয়িতুং বহুশোঽচেষ্টত। তত্র বাক্পারুষ্যেন বিবদমানয়ো স্তয়োর্যুদ্ধে সঞ্জাতে জগন্নাথো রাজকুমারস্য শিরশ্ছিত্বা শ্বশুরান্তিকমনয়ৎ। তচ্ছিন্নমুণ্ডমবলোক্য গোবিন্দমাণিক্যস্তং তীব্রং ভর্ৎসয়ামাস। ততোমহারাজশ্চট্টলে কতি দিনমবস্থায় রসাংপ্রদেশং যযৌ। আরাকানাধিপতিস্তু স্বদেশে বন্ধোর্গোবিন্দমাণিক্যস্যাগমনং শ্রুত্বা সত্বরং তমুপস্থায় বন্ধুজনোচিতং সৌজন্যং প্রদর্শ্য রাজধানীমুপনীয় সুখং বাসয়ামাস। অথৈকসপ্তত্যধিকদশশত-ত্রৈপুরবৎসরে দিল্লীশ্বরস্য দ্বিতীয়ঃ পুত্রঃ সুলতান্সুজাভিধেয়ঃ স্বভ্রাত্রা আবংজেবেন পরাজিতঃ পলায়মানঃ রসাং-প্রদেশমুপাযযৌ। কদাচিৎ গোবিন্দমাণিক্যেন সহ সভায়ামুপবিষ্টে তস্মিন্নারাকানাধিপতৌ স দিল্লীশ্বরনন্দনস্তত্রোপগম্য দণ্ডায়মান এব স্বপরিচয়ং বিজ্ঞাপিতবান্। রসাংরাজস্তু যবন ইতি তাচ্ছিল্যেন কিমপি নাচরন্ তুষ্ণীমেব স্থিতঃ। ততোগোবিন্দমাণিক্যঃ সসম্ভ্রমমুত্থায় তমভ্যর্থয়মানঃ রসাং-রাজমনিচ্ছন্তমপ্যনুরুধ্য তস্মৈ মহার্হমাসনমুপরং প্রাদীদপৎ।

ভুক্তোযথাসময়মুত্থায় সর্ব্বে যথাস্থানং গন্তুমুদ্যতাঃ। তদা সুলতান্সুজা গোবিন্দমাণিক্যস্য করং ধৃত্বা প্রোবাচ ভো ভূপতে! ভবতাহমদ্য যদ্বহুমন্যতে তন্নামরণম্ বিস্মরিষ্যামি। সম্প্রতি হ্যয়মেব প্রিয়জনোপচারঃ, তদ্গৃহীত্বানুগৃহ্লাতুমামিত্যুক্ত্বা তস্মৈ মহার্হং হীরকাঙ্গুরীয়কং প্রদদৌ। ত্রিপুরেশস্তু বারম্বারমনুরুধ্যমানএব তজ্জগ্রাহ। অথ কিয়তা কালেন স সুলতান্সুজা আরাকানাধিপস্য দুহিতরমুদ্বাহ্য পরমসুখেন তদ্রাজধান্যামুবাস। পুনঃ স দুষ্টমতির্ষ্যদ্যহং কেনাপ্যুপায়েন শ্বশুরং হন্তুং শক্নোমি তদেতদ্রাজ্যং সকলমেবাধিকরিষ্যামীতি নিশ্চিত্য তং হন্তুং চত্বারিংশৎ যোদ্ধৃপুরুষান্ সংজগ্রাহ। অথৈকদা স রাজকুমার্য্যাঃ পিত্রালয়গমনচ্ছলেন বহুদোলাঃ সংগৃহ্য প্রত্যেকং দোলাসু সশস্ত্রং মল্লদ্বয়ং প্রবেশ্য রাজবাট্যাং প্রস্থাপিতবান্। অথ তাসু ক্রমেণ ষষ্ঠদ্বারমতিক্রম্য সপ্তমদ্বারং প্রবেষ্টুমুদ্যতেষু দোলাসু কশ্চিদ্বৃদ্ধো দৌবারিকো বহুদোলাঃ সমীক্ষ্য সন্দিগ্ধমনা দোলাবাহকান্ তদ্দ্বার্য্যবরুধ্য একস্যা দোলায়া দ্বারমুদ্ঘাট্য মল্লদ্বয়ং দদর্শ। ততঃ ক্রমেণ সর্ব্বাভ্যো দোলাভ্যো সশস্ত্রা মল্লগণাঃ নিষ্ক্রম্য দৌবারিকগণৈঃ সার্দ্ধং যুদ্ধমারেভিরে। অথ কোলাহলং শ্রুত্বা চতুর্দ্দিগ্ভ্যো রাজসৈনিকাঃ সমাগত্য তান্ মল্লগণান্নিহন্যুঃ। এতদাকর্ণ্য সুলতান্সুজা ভয়েন পলায়মানঃ স্থানান্তরং যযৌ। আরাকানাধিপতিঃ কপটাচারিণস্তস্যোদৃগসদাচরণেন জাতবৈরস্তদ্বধে কৃতসঙ্কল্পোঽপি ইতস্ততোঽন্বিষ্য তং নাপ্তবান্।

ততশ্চতুঃসপ্তত্যধিকদশশতত্রৈপুরাব্দে আরাকানরাজঃ ধাতু-ময়দেবসিংহাসনাদিকং মহার্হং বহুবিধং দ্রব্যজাতংসম্প্রদায় স্ববন্ধুং গোবিন্দমাণিক্যং স্বদেশং প্রেষয়ামাস। অথ মহা-রাজে ছত্রমাণিক্যে মৃতে রাজ্যমরাজকমবলোক্য রিপূপদ্রব-ভয়েনোদ্বিগ্নমনসস্ত্রৈপুরপাত্রমিত্রাদয়ো গোবিন্দমাণিক্যস্য চট্টলাগতিং শ্রুত্বা হর্ষব্যাকুলমনসো বিশেষজ্ঞেন দূতেন সর্ব্ব-মেব তস্মৈ নিবেদয়ন্তঃ পুনারাজ্যভারমঙ্গীকর্ত্তুং যযাচিরে। ভূপতিরপি তেষাং প্রার্থনয়া স্বরাজধানীমাগত্য তদ্বৎসরীয় আশ্বিনে মাসি শুভক্ষণে পুনর্নৃপাসনমারুরোহ। অথ দিল্লী-শ্বর আওরংজেবঃ স্বভ্রাতুঃ সুলতান্‌সুজা-নামকস্য গুপ্ত রূপেন ত্রিপুরদেশাবস্থিতিমাকর্ণ্য তং বধ্বা স্বান্তিকে প্রেরণায় ত্রিপুরেশসন্নিধিং দূতংপ্রেষিতবান্। ততঃ স ভীরুস্ত্রিপুরেশো মোগলোপদ্রবভয়েন হস্তিনঃ পঞ্চ মোগলাধিপায় উপায়নং প্রদদৌ। ইতঃপূর্ব্বং কেনাপি ত্রৈপুরভূপালেনানুস্তোনৈষ মার্গঃ। গোবিন্দমাণিক্যএব প্রথমং তদাচরৎ। ততস্তেন শ্রীমচ্চন্দ্রশেখরে মন্দিরমেকং নির্ম্মায় তৎপ্রীত্যায়ুৎসৃজে। অয়মত্র গোবিন্দসাগরোঽন্যত্রাপি বহ্ব্যঃ পুষ্করিণ্যস্তেনৈবোৎ-সর্গীকৃতাঃ। ততঃ স গঙ্গায়াং গত্বা কাঞ্চনতুলাপুরুষদানমনুষ্ঠায় তাম্রফলকলিখিতেন সনন্দেন ব্রাহ্মণেভ্যো বহ্বীং ভূমিমদাৎ। রাজ্ঞ্যা গুণবত্যা তু মুরনগরপ্রদেশে নাম্না গুণসাগরং সরঃ প্রতিষ্ঠিতং। প্রাবৃষি গোমতীজলপ্লাবনেন মেহেরকুলপ্রদেশঃ প্রজাবাসাযোগ্য আসীৎ। গোবিন্দমাণিক্যএব তস্যাস্তীরয়োঃ

সেতুং বধ্বা জলবেগং রুরোধ। তদযাবৎ ক্রমেণ তত্র জনাঃ বহুলং বাসস্থানং চক্রিরে। পুরা সুলতান্সুজা যদ্ধীরকাঙ্গু-রীয়কং তস্মৈ প্রদদৌ স তন্মূল্যব্যয়েন "সুজামসজিদ্" ইত্যাখ্যমিষ্টকগৃহং সুজাগঞ্জং নাম হট্টঞ্চ স্থাপিতবান্। পুরারাকানাধিপতিনা চন্দ্রশেখরে যৎ পূজনাদিকার্য্যজাতং বিলুপ্তীকৃতং গোবিন্দমাণিক্যেনৈব নিজব্যয়েন তৎ সর্ব্বং পুনঃ প্রতিষ্ঠিতং। ইতি